গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত



ভূতের গল্পের সঙ্কলন

দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৩

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২-১, কর্নওআলিস স্ট্রীট
দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর পুলিনবিহারী সামন্ত, ১০, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

ত্রৈলোক্যনাথ হতে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সকল বিশিষ্ট লেখকের লেখা ভূতের গল্প সঙ্কলন ক'রে দিলাম এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের গল্প এই সংগ্রহে নেই। তার কারণ এ নয় যে রবীন্দ্রনাথ ভূতের গল্প লেখেন নি। তার কারণ রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিখ্যাত রচনা 'ক্ষুধিত-পাষাণ', 'কঙ্কাল', এই সংগ্রহের গণ্ডির বাইরে। বড় হয়ে সেই সব গল্প তোমরা পড়বে।

'শ্রীকান্ত' হতে যে কাহিনীটি এই সঙ্কলনে ছাপা হল সেই খণ্ড রচনাটুকুই সম্ভবত সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের মধ্যে অশরীরী বা ভৌতিক কাহিনী রচনার একমাত্র উদাহরণ। তাই সুবৃহৎ উপন্যাস হতে শরৎচন্দ্রের ভাষা অব্যাহত রেখে ছোট্ট এই কাহিনীটুকু ছেঁকে আলাদা ক'রে ভূতের গল্পের সঙ্কলনের পাঠকদের উপহার দিলাম।

প্রমথ চৌধুরীর 'যখ' গল্পটিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে অনেকটা ঐ প্রণালীতে। লেখক সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের তিনি একজন শক্তিমান পুরুষ। বাংলা গদ্যের মুক্তিদাতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্থান। এই সূত্রে তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

ভূতের গল্প প'ড়ে যারা ভয় পায় এবং যারা
পায় না তাদের সবার জন্যে।—যারা
ভূতের গল্প পড়েই না
তাদের জন্যে নয়।

হরতনের গোলাম

—১—

তোমরা অনেক আশ্চর্য ঘটনা কানে শুনেছ, কিন্তু আমি চোখে দেখেছি এক অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত ঘটনা। তখন আমার বয়স অল্প— বোধ হয় তেরো-চোদ্দ।

বৃন্দাবন, ডাক-নাম বিন্নু, ছিল আমার সব-চেয়ে ভালোবাসার বন্ধু। এক ক্লাসে পড়তুম, দিনরাত একসঙ্গে থাকতুম, সে ছাড়া আর কারো সঙ্গে খেলতে, কথা-কইতে আমার ভাল লাগতনা। আমাদের কাছেই ছিল তাদের বাড়ি।

তখন আমরা নতুন তাস খেলতে শিখেছি। বিন্নু সেবার একদিনের জন্য মামার বাড়ি গিয়ে বিন্তি খেলা শিখে এসেছিল। এসেই সে আমায় ঐ খেলা শিখিয়ে দিলে। দু-জনেই নতুন খেলিয়ে, কিন্তু বিন্নু দু-চার বাজি খেলেই পাকা ওস্তাদ হয়ে উঠলো। আমি প্রায় প্রতি হাতেই তার কাছে হারতুম। কোথায়ই বা তাকে জিতেছি? স্কুলের লেখা-পড়ার প্রাইজে, খেলাধূলার প্রাইজে সে বরাবরই আমায় হারিয়ে এসেছে; এমন কি নিমন্ত্রণ খেতে বসেও কোনো দিন তাকে জিততে পারিনি; সে বরাবর আমার চেয়ে বেশি পেয়েছে। এক-এক সময় সন্দেহ হতো আমার মায়ের স্নেহটিও বুঝি সে আমার চেয়ে বেশি-ক'রে জিতে নিলে। কিন্তু এতে আমার দুঃখ ছিল না। কারণ তাকে যে আমি সত্যিই ভালোবাসতুম।

রোজ সন্ধ্যার পর স্কুলের পড়া শেষ ক'রে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সদর-বাড়ির পশ্চিম কোণে ভাঙা নহবৎ-খানার নীচের অন্ধকার ঘরটায় লুকিয়ে বসে তাস খেলতুম। এই ঘরটায় পুরাকালে কে থাকত জানিনা; এ বাড়ি যখন জমজমাট ছিল, তখন হয় তো কর্তাদের সানাই-ওয়ালারা এইখানে বস-বাস করত। এখন এখানে দিনে-রাতে কারো পায়ের ধুলো পড়ে না—এক চুপি-চুপি আমাদের ছাড়া। এই ঘরটা আমাদের দুই-বন্ধুর ভারি মনের-মতো ঘর ছিল—এর মধ্যে বাড়ির ভিতরকার তাড়াহুড়ো এসে পৌছতে পারতনা; আমরা দু-জনে পায়রার খোপের মতো একটুখানি জায়গায় বেশ নির্জনে নিশ্চিন্তে মুখোমুখি বসে মনের সুখে অবিরাম গল্‌গল্‌ করতে পারতুম। আমাদের ছুটির দিনগুলো নির্বিঘ্নে নিবিড় আনন্দে কাটত—এই ঘরখানির কোলে মাথা রেখে শুয়ে। বিনু নিজের হাতে ঐ ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখত। এর কোনো আভরণ ছিলনা—এর সমস্ত অভাব ও দৈন্যকে আমরা আমাদের অন্তরের আনন্দ দিয়ে ঢেকে রেখেছিলুম। নইলে সেই কঙ্কাল-সার জীর্ণ অন্ধকার কোটরের মধ্যে আমাদের কচি দুটো প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠতে পারত না।

বিনু মামার বাড়ি থেকে এক-জোড়া তাস সংগ্রহ ক'রে এনেছিল বোধ হয় তার মামাদের আড্ডার পরিত্যক্ত তাস। তাস-জোড়াটা ছিল খুবই পুরানো—ভদ্রসমাজে নিতান্তই অচল। সম্ভবত তাই এত সহজে সে-বেচারা ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কড়া হাতের কঠিন চাপড় থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিনুর ছোট্ট নরম হাত-খানিতে এসে পড়বার সৌভাগ্য পেয়েছিল। বেচারাকে যে অনেক দিন ধরে অনেক চড়-চাপড় সইতে হয়েছে সে তার চেহারা দেখলেই বোঝা যেত। কিন্তু

কোন গুরুতর অপরাধে তার কানগুলো যে এমন নির্দয়ভাবে কাটা গিয়েছিল এবং কেনই বা তার বুকের উপর আঁচড় টেনে-টেনে এমন ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারতুম না। এ তার কোন পাপের শাস্তি?—কে জানে!

তার এই জীর্ণশীর্ণ চেহারা দেখে আমাদের কেমন মায়া করত; সেই জন্যে তার উপর জোরজবরদস্তি করতে পারতুম না। একে নিয়ে অতি সন্তর্পণে খেলতুম;—আস্তে-আস্তে তুলতুম, আস্তে-আস্তে ফেলতুম, ভাঁজাতুম খুব আল্‌গা হাতে। খেলা শেষ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে গুছিয়ে একখানি রুমাল মুড়ে তুলে রাখতুম—অতি যত্নে। সত্যি বল্‌ছি এই তাসকে এত ভালোবাসতুম আমরা যে এর বদলে নতুন্ ঝক্‌ঝকে তাস কিনে আনতে আমাদের লোভটুকু পর্যন্ত হয়নি কোনো দিন। এই তাসের ছবি দেখে আমার মনে হতো—এরা যেন এক-কালে এই বাড়িরই মানুষ ছিল, এখন তাস হয়ে গেছে। তোমরা হেসো না: এর হরতনের গোলামটিকে আমার মনে হতো ঠিক যেন বুড়ো ঠাকুর্দার দরোয়ান এ! এর ফোঁটা-ওয়ালা তাসগুলোও যেন কেমন-এক-রকমের। এক-একদিন বিনুর সঙ্গে খেলতে-খেলতে প্রদীপের ঝাপ্‌শা আলোয় এর আটা-নওলা-দওলার রঙিন ফুট্‌কিগুলোর দিকে চেয়ে-চেয়ে হঠাৎ আমার চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যেত—মনে হতো আমি যেন তাদের ঐ ফুট্‌কিগুলোর ফাটলের মধ্যে দিয়ে কতদূর চলে গেছি—সে যেন কতকালের আগেকার কোনখানে!—যারা অনেক-কাল আগে এখানে ছিল যেন তাদের কাছে! সেখানে কি দেখতুম, কি শুনতুম মনে নেই কিন্তু সে-সব দেখে-শুনে কেমন তন্ময় হয়ে যেতুম। হঠাৎ বিনুর ডাকে আবার ফিরে আসতুম। সে ধমক দিয়ে বল্‌তো—"কি বসে-বসে ভাবচিস?—খ্যাল্‌না!" আমি অমনি তাড়াতাড়ি

যা-হোক-একখানা তাস ফেলে দিয়ে খেলায় আবার মন দিতুম। কিন্তু বুকটা কেমন ছমছম্ করতে থাকতো। মনে হতো এ নিশ্চয় যাদু করা তাস!

বিনুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"এই তাস নিয়ে তোর মামার বাড়িতে কারা খেলতবে বিনু?" বিনু বলেছিল—"শুনেছি দাদামশাই খুব পাকা খেলিয়ে ছিলেন, কেউ না-কি তাঁকে তাস-খেলায় হারাতে পারত না। লোকে হিংসে ক'রে বলতো, সে তাঁর খেলার গুণ নয়, তাসের গুণ! তিনি তাস গুণ করতে জানতেন। বোধ হয় এ তারই আমলের তাস।" বিনুর দাদামশাইকে আমরা চোখে দেখিনি, তার মামাদেরই দেখতুম খুব বুড়ো। উঃ, তাহলে না জানি তিনি কত বুড়ো! এ সেই আদ্যিকালের-বদ্যি-বুড়োর হাতের গুণ-করা তাস। এ তাস ছুঁতে বুক ছম ছম্ করত, কিন্তু তবু ভালোবাসতুম বিনুর-দেওয়া এই তাস জোড়াটাকে।

এই তাস নিয়ে বিনু গম্ভীর মুখে রোজ আমার সঙ্গে খেলতো। তাকে খেলায় জিততে পারতুম না বোলে সে প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতো—"জানিস মল্লি, এ আমার দাদামশাইয়ের গুণ-করা তাস। এ তাস হাতে থাকলে কেউ আমায় জিততে পারবে না,—তুইও না।"

আমাদের আড্ডা ঘরের দেযালে গোরুর চোখের মত একটা সরু কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি তেলের প্রদীপ জ্বলতো—আমাদের বসবার কোণটুকু আলো-কোরে, বাকি ঘরটা অন্ধকারের আবছায়ায় পড়ে থাকতো—কালো চাদর মুড়ি দিযে। খেলা জমে উঠতো, সঙ্গে সঙ্গে রাতের অন্ধকারও জমে উঠতো। একে-একে বাড়ির প্রদীপ সব নিভে যেত, ঘরের পাশে সরু গলির পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে আসতো। চৌধুরী-বাড়ির দোতলার জানলা থেকে..যে এক-ফালি সরু আলো এসে অন্ধকার গলির উপর পড়তো, ক্রমে সেটুকুও অস্ত যেত, গলির ফাঁকটা

ভরাট হয়ে উঠতো—জমাট অন্ধকারে! আর সেই কালো পাথরের মতো অন্ধকারের উপর দিয়ে মাঝে-মাঝে শুনতুম কে যেন পায়চারি করছে লাঠি-হাতে খড়ম-পায়ে—খট্-খটাস! খট্-খটাস্। তার পরেই খুব দূর থেকে একটা খেঁকি কুকুর বুক-ফেটে কাৎরে উঠতো—কেঁই-কেঁই! আর অমনি ঝুলের ঝালর ও মাকড়সার জাল-দিয়ে-ঘেরা আমাদের ঠাকুর্দার আমলের পুরানো ঠাকুরদালানের কাল্প্যাচা ও চামচিকে-বাদুড়গুলো অন্ধকারের মধ্যে কখনো হুস্-হুস্ কখনো হিস্-হিস্ শব্দে তাদের বাচ্ছাগুলোকে সাবধান কোরে দিত এবং মাঝে-মাঝে ফট্ফট্ কোরে হাততালির আওয়াজে কাকে যেন আমাদের ঘরের দিকে তাড়িয়ে দিত! ঐ বুঝি সে এলো! এই ভাবতে ভাবতে আমার সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসত। হাতের তাস মাটিতে নামতো না! বিন্থ ধমক দিয়ে বল্তো—"কি করছিস্? খ্যাল্ না!" তার এই ধমকানিতে আমার চট্কা ভাঙতো। আর সঙ্গে-সঙ্গে চারিদিকের ঐ বিশ্রী শব্দগুলোও যেন ভয়ে-ভয়ে চুপ কোরে যেত। তা যদি না হতো তাহলে বোধ হয় ঘর থেকে ছুটে আমি বাবার কাছে পালিয়ে যেতুম, কিছুতেই বিন্থর সঙ্গে খেলতুম না।

—২—

সেদিন খেলা আরম্ভ করতেই হঠাৎ খুব জোরে ঝড়-বৃষ্টি এলো। একটা ঝড়ের দমকা আমাদের কোলের তাসগুলোকে উল্টে-পাল্টে ভেস্তে দিয়ে ঘর থেকে খানিকটা ঝুল ও ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বিনু বল্লে—"মল্লি, দরজা-জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দে!" আমি উঠে জানলাগুলো বন্ধ করতে লাগলুম। পশ্চিমের জানলাটায় হাত দিতেই কে যেন সজোরে আমার হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড কোবে চলে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা ঘরের ভিতর ঢুকিযে নিলুম—কিছু বুঝতে পারলুম না। বুকটা ধুক্‌ধুক্ কবতে লাগলো।

খেলতে বসেই সে বাজি জিতলুম। আশ্চয কাণ্ড! যা কখনো হয় নি, তাই হলো। বিনুও অবাক। সে একটু বেশি-ক'রে মন দিযে খেলতে বস্‌লো। কিন্তু পরের বাজিও জিততে পারলে না। আমার কেমন সন্দেহ হলো—এলেমেলো ঝড এসে তাসের যাদুটা উডিযে নিযে গেল নাকি!

আমি ক্রমাগতই জিততে লাগলুম। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছিল এ জেতায় আমার কোন বাহাদুরি নেই, প্রতিবারেই এমন তাস আসছিল যে খেললেই পিঠ পাওয়া যায়; কে যেন ম্যাজিক ক'রে ভালো-ভালো তাস গুলো বেছে-বেছে আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। বিনু বার-বার হেরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠলো—"আজ আমার পডতা খারাপ পড়লো দেখছি!" তার এই দীর্ঘশ্বাসটি আমার বুকে গিয়ে বাজলো! আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। আমার মন কেঁদে বলতে লাগলো—"আমি জিত চাই না, বিনু জিতুক।" আমি ফন্দি ক'রে বিনুকে জিতিয়ে

দেবার জন্মে হাঁকুপাঁকু করতে লাগলুম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আজকের ঐ ঝড়ে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেছে!

বিনু ফেললে হরতনের বিবি, তাকে সেই পিঠটা দেবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি খেললুম গোলাম, কিন্তু পিঠ তোলবার সময় দেখা গেল গোলামটা চেহারা বদলে সাহেব হয়ে গেছে। কাজেই পিঠটা আমাকেই নিতে হলো। পরের হাতে আমি খেললুম চিঁড়ের দশ; আমি জানতুম বিনু এ দশ ফোঁটার লোভ কিছুতেই ছাড়তে পারবে না, সে নিশ্চয় গোলাম দিয়ে পিঠটা নেবে; বিনু ফেললেও গোলাম, কিন্তু আমার দশ-খানা হঠাৎ দু ফোঁটা চুরি কোরে কেমন করে যে আটা হয়ে গেল আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না। আমি অবাক; বিনু বাজি হেরে গোঁ-হয়ে বসে রইল।

রাগ হলে বিনুর বড়-বড় চোখ-দুটো আরো বড় হয়ে উঠতে দেখেছি, কিন্তু আজ যেন অস্বাভাবিক রকম বড় হয়েছে ব'লে মনে হতে লাগলো। সে-বারের খেলাতে তার হাতের ফ্রাই ইস্কাবনের দশখানার উপর চিঁড়ের সাতা পাশিয়ে দিতে গিয়ে যখন সেটা রঙের সাতার তুরুপ হয়ে গেল, তখন তার সেই হঠাৎ-বড়-হয়ে-যাওয়া চোখ দুটো কেমন-এক-রকম-ভাবে বিস্ফারিত ক'রে সে আমার দিকে চাইলে যে সে-চাহনিতে আমার সর্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ ক'রে এলো।

বিনুকে ভয়ে ভয়ে বললুম—"ভাই, আর খেলে কাজ নেই। চল্ যাই।" বিনু সে কথা কানেই তুল্লে না।

ক্রমে রাত গভীর হয়ে এলো। মনে হলো বাড়ির সবাই ঘুমিয়েছে; আমাদের এ ঘরখানারও যেন ঘুম ধরেছে;—এর দরজার-জানলা ইট কাঠ ঘুমে ঢুলছে। প্রদীপের আলোটা থেকে-থেকে কেবল হাই তুলছে। কড়িকাঠের খোপে-খোপে চড়াই-পাখীগুলো গল্প শেষ ক'রে শুয়ে

পড়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম! হাতের তাশগুলোর দিকে চেয়ে দেখি সাহেব-বিবিদের চেহারা ঘুমে জড়িয়ে আসছে। ক্রমে মনে হলো সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ঘুমের ঝোঁকে দুলছে--ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্!

হঠাৎ চট্‌কা ভাঙলো চৌধুরী-বাড়ির ঘড়ির শব্দে—ঢং! সেই শব্দ অন্ধকারের ঘুম ভাঙতে-ভাঙতে অনেক দূর চলে গেল।

ও কি? ও কিসের শব্দ? কড়িকাঠের কাছে ঐ কোণের গর্ত থেকে কে অমন বিশ্রী স্বরে নিশ্বাস টানছে হুউউউস্‌স্‌স্!—হুউউস্‌স্!

আমি চমকে উঠে বিনুকে জিজ্ঞাসা করলুম—"ও কিসের শব্দ ভাই?"

বিনু কথা কইলেনা; শুধু তাস থেকে চোখ তুলে কড়িকাঠের দিকে চাইলে, আর আমার মনে হলো তার সেই ড্যাব্‌ডেবে চাহনিটা চোখ-থেকে ঠিকরে বেরিয়ে কড়িকাঠের অন্ধকার কোণে গিয়ে এঁটে রইল—জ্বল্ জ্বল্ করে চেয়ে আমার দিকে। বিনুকে আমি কান্নার সুরে বল্‌লুম—"ভাই, আমার বড় ঘুম পেয়েছে।"

বিনু বললে—"আচ্ছা, আর দু-হাত খেল।" আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম—তার গলা শুনে। কি গম্ভীর আওয়াজ! এ তো বিনুর গলা নয়। কে তার গলার ভিতর থেকে কথা কইলে?

কোনো রকমে এই দু-হাত খেলা এখন শেষ করতে পারলে বাঁচি! কোনো দিকে কান দেবার, কোনো দিকে চোখ দেবার আমার আর সাহস হচ্ছিল না। ইচ্ছা হচ্ছিল এই তাস দিয়ে চোখ-কান ঢেকে ফেলি। আমি খুব চোখের কাছে তাস এনে এক-মনে খেলতে লাগলুম।

সে-হাত বিনু খেলেছিল রঙের নওলা। আমার হাতে গোলাম ছিল, কিন্তু পিঠ নেবার ইচ্ছা ছিল না। কি-ক'রে লুকোলে বিনু সেটা ধরতে পারবে না ভাবছি, বিনু ব'লে উঠলো সেই রকম বিষম ভারি গলায় ঘর কাঁপিয়ে—"গোলামটা আছে তো।"

ভয় হলো ধরা পড়ে গেছি। বাঁ-হাতের তাসের সারি থেকে চট্‌-ক'রে হরতনের গোলামটা তুলে নিয়ে হরতনের নওলার উপর ফেলতে গিয়ে দেখি—সামনে নওলা নেই; বিন্নুও নেই। অ্যাঁ!

বুকটা ধ্বক্‌ ক'রে উঠলো।

এ-পাশ ও-পাশ চেয়ে দেখি শুধু বিন্নু নয়, একখানি তক্তি ও নেই।

বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। চোখে অন্ধকার দেখলুম। গা-হাত-পা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করতে লাগলো। ঘরের চার কোণ থেকে চারটে বিকট হাসি খিল্‌খিল্‌ শব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। আর উপরের নহবৎখানা থেকে ঢাক ঢোল কাঁসি বাঁশি সব এক সঙ্গে বেজে উঠলো। আমি কাঁপতে-কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়লুম। মনে হলো আমার হাত-পায়ের সমস্ত খিল যেন আল্‌গা হয়ে গেছে—উঠে-হেঁটে পালাবার আর উপায় নেই।

আমার কান্না আসতে লাগলো—বিন্নু—আমার বিন্নু কোথায় গেল? উপর থেকে ভাঙা কাঁসিখানা ফাটা আওয়াজে বলতে লাগলো—কৈ না না! কৈ না না! আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকলুম—বিন্নু, বিন্নু! কিন্তু আমার গলার স্বর মুখ দিয়ে না বেরিয়ে পেটের ভিতর চলে গেল—ঘুরতে-ঘুরতে, গোঁ-গোঁ-শব্দে!

একবার আশা হলো বিন্নু হয়তো বাইরে গেছে—এখনি আসবে। কিন্তু বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে তাসটা নিয়েছি মাত্র—এই এতটুকু সময়ের মধ্যে সে এতবড় ঘর পেরিয়ে বাইরে গেল কেমন করে? হয়তো আমি অন্ধকারে দেখতে পাইনি। তাই হবে। এই মনে ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম, কিন্তু গিয়ে দেখি—একি যেমন খিল বন্ধ করেছিলুম, ঠিক তেমনই আছে। তবে সে কেমন ক'রে বাইরে গেল?

হঠাৎ মনে হলো বিন্থ আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই ঘরের মধ্যে লুকিয়ে নেই তো!

কিন্তু কোথায় লুকোবে? ঘর যে ফাঁকা। আসবাবের মধ্যে মাত্র একটা ভাঙা আলমারি। তার পেছনে বড় জোর আঙ্গুল পাঁচেক জায়গা। তার মধ্যে একটা মানুষ থাকতে পারেনা। তবু সেখানটা একবার দেখলুম। ঘরের একোণ ওকোণ এধার ওধার প্রদীপ ধ'রে দেখলুম তন্ন তন্ন ক'রে। কিন্তু সে কোথাও নেই—কোথাও নেই!

—৩—

কতক্ষণ পড়ে-পড়ে কেঁদেছিলুম জানি-না। যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখনও কান্নার জলে চোখ আমার ঝাপ্‌শা। রাত তখন নিশুতি। চারিদিক নিঝুম। কেউ কোথাও নেই; কেবল আমাদের তিন মহল প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখলুম ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঠ-হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; যেন তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে! চৌধুরীদের চৌতলার চিলের ছাদটা আমাদের দিকে এতখানি গলা-বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কি হ'ল রে, কি হল? কোথায় গেল?" পশ্চিম-কোণের ঢ্যাঙা সুপারিগাছটা কিছু না ব'লে শুধু ডিঙি-মেরে আকাশের দিকে মুখ-তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিলে—আমাদের বাড়ির ঠিক মাথায় একটা মস্ত-বড় কালো পাখী তাসের মতো নানা রঙে চিত্র-বিচিত্র-করা ডানা মেলে মেঘের ধার দিয়ে অন্ধকারে ভেসে চলেছে—কাকে ঠোঁটে নিয়ে! তাই দেখে চারিদিক থেকে চাপা গলায় সবাই ব'লে উঠলো—"আ হা হা!" অমনি আমার বুকের ভিতরটা ক'রে উঠলো—"আহাহা! বিনুকে ওরা ভেল্‌কি-বাজিতে উড়িয়ে নিয়ে গেল!"

ভাবতে-ভাবতে আমার চোখের সামনে থেকে যেন সব একে-একে মুছে আসতে লাগলো, পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা ধীরে-ধীরে সরে যেতে লাগলো; আমি যেন একটা অতল অন্ধকারের মধ্যে ডুবতে লাগলুম—পলে-পলে, তালে-তালে!

তার পর মনে পড়ে অন্ধকারে চেনা-পথ ধ'রে বাড়ির ভিতরের দিকে যাচ্ছিলুম; হঠাৎ কানে এলো তাস পেটার শব্দ—চটাস্‌-চটাস্‌! এত রাত্রে এখানে অন্ধকারে তাস খেলে কে? মুহূর্তের মধ্যে

আমার চলা বন্ধ হয়ে গেল. আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলুম।

বারান্দার পশ্চিম-কোণে ঘুরঘুট্টে অন্ধকারের মধ্যে আমাদের খাজনা-ঘর। দিনের বেলা এর সামনে দিয়ে যেতে আমাদের গা-ছম্‌ছম্‌ করে, সে জন্য এ-দিকটা আমরা কেউ মাড়াতুম না। আমাদের বিশ্বাস যত রাজ্যের ভূতপ্রেত ঐখানে বাসা বেঁধে মনের সুখে ঘরকন্না করচে। আমরা ঐ মহলটা তাদের ছেড়ে দিয়েছিলুম। সেখানে কস্মিনকালে সকাল-সন্ধ্যায় আলো-গঙ্গাজল পড়ত না,—ঝাঁটও কেউ দিত না। এই খাজনা-ঘর যে কতকালের তা কেউ জানে না,—বাড়ির মধ্যে সব-চেয়ে পুরানো এই জায়গাটা। শোনা যায়, ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর আমলে জমিদারির খাজনা এলে এই ঘরে গচ্ছিত রাখা হতো—মাটির তলায় একটা চৌখুপির মধ্যে। সরু সুড়ঙ্গের মতো এই ঘর, সামনে মোটা মোটা লোহার গরাদে-দেওয়া খাঁচার মতো দরজা—পিতলের শিকল দিয়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়ানো। সামনে দাঁড়ালে একটা স্যাঁৎসেঁতে পচা গন্ধ নাকে আসে, আর চোখে পড়ে কালি-ঝুলি-মাখা একটা অন্ধকারের কুণ্ডলী—দিন-রাত ঘূর্ণির মতো ঘুরচে।

এই ঘর কতকাল যে খোলা হয়নি তার ঠিক নেই। খোলবার দরকারই হয়-নি। কারণ বহুদিন হলো আমাদের সে জমিদারী নেই, তার খাজনাও আর আসে না। ঠাকুরমার মুখে গল্প শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদার যিনি ঠাকুরদাদা ছিলেন তাঁর অগাধ টাকা ছিল—একটা রাজা-রাজড়ার তেমন থাকে না। কিন্তু তিনি ভারি কৃপণ ছিলেন। একটি পয়সাও কাউকে প্রাণ থাকতে দিতে পারতেন না—এমন কি নিজের ছেলে-মেয়েকেও নয়। তিনি কেবল টাকার পর টাকার রাশ

জমা ক'রে চলতেন। লোকে টাকা খরচ ক'রে নাম কেনে, তিনি টাকা না খরচ করার বাহাদুরিতে লোকের কাছে খেতাব পেয়েছিলেন! টাকার উপর তাঁর এমন মায়া ছিল যে, পাছে মারা যাবার পর তাঁর টাকা খরচ হয়ে যায় এই ভয়ে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব যখের হাতে সমর্পণ ক'রে যান—যার কাছ থেকে একটি কাণা-কড়িও বার হবার যো নেই!

এই যখের কাহিনী একটা মস্ত-বড় গল্প! কেমন-কোরে একটি সুন্দর নয়বছরের ছেলেকে মেঠাই ও খেল্‌নার লোভ দেখিয়ে তার বাপ-মায়ের কাছ থেকে চুরি ক'রে আনা হয়, কেমন ক'রে তাকে লাল চেলি পরিয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে, ঐ অন্ধকার খাজনা-ঘরের তলায় বন্ধ চৌখুপির মধ্যে—যেখানে কেবল ঘড়া-ঘড়া টাকা সাজানো আছে, আর-কিছু নেই, আর-কেউ নেই—না বাপ, না মা, না আলো, না বাতাস—সেইখানে একলাটি বসিয়ে রেখে, তার পর ঐ চৌখুপিতে ঢোকবার পথটা দশ-মণ পাথর দিয়ে চিরদিনের মতো বুজিয়ে দেওয়া হয়, সে কথা শুনতে-শুনতে আমার চোখে জল আসতো—বুক দুর-দুর করতো; আর ঠাকুরদাদার সেই পাষণ্ড ঠাকুর্দার উপর রাগ হতো। ঠাকুরমা বলতেন—"আহা, ঐ সুন্দর নয় বছরের ছেলেটি কত কেঁদেছে, বাবা-বাবা-ক'রে বুক-ফেটে কত চেঁচিয়েছে তেষ্টায় একফোঁটা জলের জন্য ছট্‌ফট্‌ করেছে, তবু কেউ তাকে ঐ চৌখুপির দরজা খুলে দেয়নি।" শুনে আমার গলা কাঠ হয়ে আসতো। তার পর ক্ষিধে-তৃষ্ণায়-ভয়ে কাতরাতে-কাতারাতে বেচারা কখন যে হাঁফিয়ে মরে গেছে, সে হয়তো নিজেই বুঝতে পারেনি। এখন সে যখ হয়ে আছে—ঐখানে বসে-বসে কেবল টাকার ঘড়া আগলাচ্ছে। কারো সাধ্য নেই যে ঐ টাকা সেখান থেকে নিয়ে আসে! আমার

ঠাকুরদাদার বাবা না কি একবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বেশি দূর যেতে হয়নি; মেজের পাথরে একটি মাত্র শাবলের ঘা দিতেই তিনি গোঁ-গোঁ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তিন দিন তাঁর কাঁপুনি ছিল; সাত দিন তাঁর মুখে রা ছিল না। কেন যে এমন হলো, কেউ জানেনা, তিনি নিজেও কিছু বলেননি; কারো সাহসও হয়নি জিজ্ঞাসা করতে। সেই থেকে ঐ ঘরের দিকে আর কেউ যায় না।

মনে হলো ঐ খাজনা-ঘর থেকেই যেন তাস-খেলার শব্দ পেলুম। যদিও ওদিকে যেতে বুক দুরদুর করতে লাগলো, কিন্তু বিনুর জন্যে না গিয়ে পারলুম না; যদি সে ওখানে থাকে—যদি সে আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে আসে।

বুকটা দু-হাতে চেপে খাজনা-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। লোহার গরাদে-দেওয়া দরজা দিনের বেলা শিকল-দিয়ে বাঁধা থাকে কিন্তু এখন দেখলুম খোলা। অন্ধকারে চোখে কিছু দেখা গেলনা, কিন্তু কানে শোনা গেল—কারা দুজন যেন দরজার দুইধার থেকে সজোরে ছুটে এসে মাথায়-মাথায় অনবরত ঠোকা-ঠুকি করছে—দুম্, দুম্, দুম্! আমার কেমন মনে হলো যেন এইখানকার এই অগাধ সম্পত্তি এই যখের ধন—কে নেবে তাই নিয়ে দুই ভূতেই লড়াই চলেছে। আমি এক-মনে এদের লড়াইয়ের তাল গুনছি, হঠাৎ বিনুর মতো কার গলা পেলুম। সে বলছে—"বিবির চেয়ে রঙের গোলাম বড়।" আর-একজন কে সরু গলায় বলে উঠলো—"দূর বোকা, তা কখন হয়? গোলাম হলো সাহেব-বিবির চিরকেলে কেনা গোলাম; হ'লই না-হয় সে রঙ মেখেছে!"

গোড়ায়-গোড়ায় আমিও একদিন বিনুকে বলেছিলুম—"গোলাম

কেন বিবির চেয়ে বড় হবে বিন্নু ?" বিন্নু বলেছিল—"এই-রকম যে নিয়ম।" আজও আবার সেই কথা উঠেছে। এও তাহলে আমাদের মতন নতুন খেলিয়ে দেখছি।

আবার শুনলুম—"তুই কিচ্ছুই খেলতে পারিস না! মল্লি তোর চেয়ে ঢের ভালো খেলে।" বিন্নু আমায় ডাকতো মল্লি ব'লে।

মনে হলো, আমার যখন নাম করছে, এ তখন নিশ্চয় বিন্নু! বিন্নুর গলায় আমার নাম শুনে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যাবার জন্যে আমার প্রাণটা আকুলি-ব্যাকুলি করতে লাগলো, কিন্তু পারলুম না; ভয় হলো, পাছে ঐ দুটো পাগলা ভূতের মাথা-ঠোকাঠুকির মধ্যে পড়ে থেঁৎলে যাই! আমি চুপ-ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ অন্য লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো—"অ্যাঁ, হরতনের গোলাম কোথায় গেল? হরতনের গোলাম! ভারি আশ্চর্য!—এই ছিল, এই নেই! চোখের পাতা ফেলতে-না-ফেলতেই উড়ে গেল?"

আমার ভারি হাসি পেল—ঐ যাদু-করা তাস এদের সঙ্গেও যাদু খেলছে দেখছি!

বিন্নু বলে উঠলো—"হরতনের গোলাম?—সে তো মল্লির হাতে।"

আমি নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখি—সত্যিই তো, সেই হরতনের গোলাম, যা দিয়ে বিন্নুর নওলার পিঠ নিতে গিয়েছিলুম, সেখানা আমার হাতেই রয়েছে তো!

অন্য লোকটা ব'লে উঠলো—"কৈ হ্যায়—মল্লিবাবুকো পাকাড় লে আও!"

সেই শুনে আমি তাড়াতাড়ি হরতনের গোলামখানা খাজনা-ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে এক-ছুটে নিজের শোবার-ঘরে পালিয়ে এলুম।

ঘরে এসেও ভয়ে বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করতে লাগলো—এই বুঝি সে এসে আমায় ঝাঁপ্‌টে ধরে নিয়ে যায়! আমি পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। খানিকক্ষণ কেউ এলোনা, তারপর কে একজন খস্‌খস্ শব্দে বারান্দা দিয়ে চলে গেল—বোধ হয় আমার ঘর চিনতে পারলে না। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছি, এমন সময় কে আবার তড়াক-ক'রে লাফিয়ে আমার বিছানায় উঠলো—আমি ভয়ে কাঠ! যে এলো, সে খানিক বিছানার এদিক ওদিক ঘুরে-ঘুরে আমার গা শুঁকেশুঁকে বেড়াতে লাগলো; তারপর আমার মাথার কাছে এসে মুখ-ঢাকা চাদরখানা ধরে সজোরে টানতে লাগলো—মুখ খুলে দেখবে। ওরে বাবারে! আমি প্রাণপণে চাদরখানা আঁকড়ে রইলুম, কিছুতেই মুখ খুল্‌তে দিলুম না। তারপর সে পায়ের দিকে গেল। তার নিশ্বাসের হাওয়ায় আমার পা-দুখানা ঠাণ্ডা হিম হয়ে এলো। আমার পা-ধ'রে হিড়-হিড়-ক'রে টেনে নিয়ে যাবে না ত? ভয়ে পা গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, না। খানিকক্ষণ সে চুপ ক'রে রইলো, বোধ হয় কি ভাবলে, তারপর আমার পাশে এসে ধুপ-কোরে শুয়ে পড়লো। সর্বনাশ! এখন করি কি! কিন্তু ঠিক সেই সময় আমার পুষি-বেড়ালটা ম্যাঁও-শব্দে ডেকে উঠতেই, সে তড়াক কোরে বিছানা থেকে লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

পুষিকে কাছে পেয়ে আমার ভয় অনেক ভেঙ্গে গেল। তখন আবার বিনুর ভাবনা এলো—তা'হলে সত্যিই কি বিনুকে ওরা ঐখানেই—ঐ চৌখুপির মধ্যে নিয়ে গেল! সেখান থেকে সে পালিয়ে

আসবে কি কোরে? এই সব ভাবছি, হঠাৎ কে কানের কাছে মুখ এনে খুব চুপি-চুপি ডাকলে—"মল্লি, ভাই মল্লি! বিনুর কাছে যাবে? বিনুর কাছে!"

আমি ধড়মড়-কোরে উঠে বসলুম—বিনুর কাছে যাবার জন্যে বুকটা লাফিয়ে উঠলো, কিন্তু ভারি ভয় হতে লাগলো—যদি আর ফিরে আসতে না পারি?

সে তখন বল্লে—"ভয় কি! চল না! বিনু তোমার জন্যে বড় কাঁদছে।"

বিনুর কান্নার কথা শুনে আমার বুক ফেটে যেতে লাগলো। আমি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বল্‌তে লাগলুম—"ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বিনুকে এবার ফিরিয়ে এনে দাও—বিনুর জন্যে আমার বড্ড মন-কেমন করছে।"

আমার কান্না শুনে সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দেখলুম, একটা মস্ত পাগড়িওয়ালা চেহারা—ঠিক যেন হরতনের গোলাম।

এই হরতনের গোলামটিকে তাসের মধ্যে সবচেয়ে আমি বেশি ভালোবাসতুম। আমাদের বাড়িতে যে বুড়ো থুরথুরে দরোয়ান ছিল—ঠাকুরদাদার আমলের, তাকে খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অল্প-অল্প তার চেহারা মনে পড়ে; কিন্তু বেশ মনে আছে রোজ সকালে সে একটি কোরে রসমুণ্ডি আমায় খাওয়াত। কি মিষ্টি লাগতো সে রসমুণ্ডি! এখনো যেন তার স্বাদ মুখে লেগে আছে। আমার মনে হলো, এই হরতনের গোলাম যেন সেই বুড়ো দরোয়ান—এখন তাসের ছবি হয়ে গেছে। সে বোধ হয় আমার কান্না দেখে লাঠি-হাতে বিনুকে খুঁজে আনতে গেল। আবছায়ার মতো মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার

পুষি-বেড়ালটা হারিয়ে যেতে, আমার কান্না দেখে, সে এমনি-ক'রে একদিন তাকে খুঁজে আনতে বেরিয়েছিল।

কতক্ষণ গেল; ঘরের ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করতে-করতে কতদূর চলে গেল, মনের মধ্যে কত ভাবনা এলো-গেল—তবু বিনু এলোনা। হায়, সে কি আর আসবে? ঐ ভয়ঙ্কর চৌখুপি ঘর—যার সামনে দুটো ভীষণ ভূত মাথা ঠোকাঠুকি করছে অনবরত, সেখান থেকে বিনুকে কে উদ্ধার কোরে আনবে? ভাবতে-ভাবতে আমার শরীর এলিয়ে আসতে লাগলো, চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগলো, কপালে যেন কে নরম ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলে; আর অমনি এক-নিমেষে মনে হলো, আমি যেন একখানা তাসের উপর শুয়ে কোথায় চলেছি—হাওয়ার সঙ্গে ভেসে-ভেসে!

তাসখানা ভাসতে-ভাসতে এসে আমায় একটা চারিদিক-আঁটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিলে। দেখলুম সেই অন্ধকারে বসে দুজন এক-মনে তাস খেলছে; বিনু আর একটি ছোট ছেলে—সুন্দর দেখতে, থোকা থোকা কোঁকড়া চুল চাঁদের মতো কপালের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক যেন বিনুর ছোট ভাইটি। বিনু তার সঙ্গে খেলতে লাগলো, আমার দিকে একবার চেয়েও দেখলে না। আমার ভারি রাগ হলো—হিংসেও হলো। এরি মধ্যে এর সঙ্গে এত ভাব! আমি মুখ গোঁ-করে রইলুম।

ছেলেটি একেবারে তাস থেকে মুখ তুলে মিষ্টি স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—"এ কে, বিনু?"

বিনু গম্ভীর গলায় বললে—"ও মল্লি!"

সে বললে—"বেশ হলো; আমরা তিনটি ভাইয়ে কেমন একসঙ্গে এইখানে থাকব!"

আমি রেগে চীৎকার কোরে উঠলুম—"না, না—আমি এখানে কিছুতেই থাকব না!"

অমনি হরতনের গোলাম এসে আমায় পিঠে-কোরে তুলে নিলে। বিন্নু সেটার উপর লাফিয়ে চড়তেই সেখানা ভারি হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মজা দেখে ছেলেটা খিল্‌-খিল্‌-কোরে হেসে উঠলো।

বিন্নু বললে—"দাঁড়া, আমরা তিন জনেই এক-সঙ্গে যাব।"—ব'লে সে ছেলেটির কানে-কানে কি বললে। ছেলেটি বললে—"চল, যাই।" কিন্তু উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ধুপ-ক'রে পড়ে গেল। দিন-রাত এক-জায়গায় বসে থেকে-থেকে তার পা অসাড় হয়ে গেছে। বিন্নু তাকে কোলে-কোরে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তাসগুলোকে কি বললে, তারা ফর-ফর ক'রে উড়ে এসে পাখীর মতো ডানা ছড়িয়ে দাঁড়ালো। আমরা উড়তে যাচ্ছি, এমন সময় কড়ি-কাঠ থেকে দুটো কালো চামচিকে এসে তাসগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর দুই দল যা যুদ্ধ। আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! আমি ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌-ক'রে কাঁপতে লাগলুম। চারিদিক থেকে অন্ধকারগুলো ছুটে এসে আমাদের সামনে তালগোল পাকিয়ে পথ-আটকে দাঁড়ালো!—যেন আমরা পালাতে না পারি! ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে—"বিন্নু, দেখছিস তো, এরা আমায় যেতে দেবে না! তোরা কেন প্রাণে মরবি? পালা!"

বিন্নু বল্লে—"না ভাই, তোকে ছেড়ে কিছুতেই যাবনা।" চামচিকে দুটো তাই শুনে ফ্যাঁস্‌ ক'রে উঠলো। এমন সময় হরতনের গোলামটা ছুটে গিয়ে একটা চামচিকের পেটে সজোরে এক ঘুসি বসিয়ে দিলে; চামচিকেটা তার ধারালো নখ দিয়ে হরতনের গোলামখানাকে আঁকড়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়লো, আর সেই ফাঁকে অন্য তাসগুলো আমাকে

নিয়ে উড়ে পালালো। বিন্নু আর সেই ছেলেটি দেখলুম সেই ঝটাপটির মধ্যে হিম্‌সিম্‌ খাচ্ছে! আমি তাসের উপর থেকে হাত-বাড়িয়ে বিন্নুকে ডাকতে লাগলুম—"বিন্নু, আয় আয়!" বিন্নু আমার দিকে ফিরেই চাইলে না; ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। আমার কান্না পেতে লাগলো! তাসগুলো উড়তে-উড়তে এসে আমাকে বিছানায় ফেলেই উড়ে গেল—বোধ হয় বিন্নুদের উদ্ধার করতে। তার পর কি হলো জানি না!

"মল্লি! মল্লি!"

আমি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলুম! ঝড়ের মতো ধাক্কা দিয়ে কে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। সকালের আলোয় ঘরটা আলো হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন একটা প্রকাণ্ড দুঃস্বপ্ন কেটে গেল। আমি ছুটে গিয়ে দুই-হাতে বিনুর গলা জড়িয়ে ধরলুম,—"বিনু, এসেছিস ভাই, এসেছিস?"

সে বললে—"আসব না ত কি! তুই স্টুপিড্ এত বেলা অবধি ঘুমচ্ছিস কেন?"

আমি বল্লুম—"কখন্ এলি ভাই!"

সে বল্লে—"অনেকক্ষণ! তোকে ডেকে-ডেকে আমার গলা চিরে গেল। তোর আজ হয়েছে কি? চোখ অমন রাঙা কেন?"

আমার ধাঁধা লাগলো। বিনু তো সবই জানে, তবে এমন আশ্চর্য হচ্ছে কেন?

আমি আমতা-আমতা ক'রে বললুম—"কাল রাত্রে তুই খেলতে-খেলতে হঠাৎ অমন অন্তর্ধান—"

সে বাধা দিয়ে বল্লে—"আমি কেন অন্তর্দ্ধান হতে যাব? তুইতো খেলা ফেলে চোখ মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলি।"

আমার আরও ধাঁধা লাগলো। এ কি ঘুমের ঝোঁকে সবই স্বপ্নের মতো দেখলুম! কিন্তু এত যে কাণ্ড, সে সবই স্বপ্ন? ইচ্ছা হচ্ছিল আগাগোড়া সব কথা বিনুকে খুলে ব'লে হেঁয়ালিটা পরিষ্কার কোরে নিই, কিন্তু পারলুম না। দিনের আলোয় কথাগুলো এমন অদ্ভুত বোধ

হতে লাগলো যে বলতে লজ্জা হলো। আমার ভূতের ভয়ের জন্যে বিনু বা আমায় ঠাট্টা করে!

বিনু বল্লে—"কি ভাবছিস? চল বাইরে যাই।"

আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের সেই বাইরের ঘরে গিয়ে দেখি—ঘরময় তাস ছড়ানো; সমস্ত দেহ তাদের ক্ষত-বিক্ষত! তাদের বুকের উপর যেন মনের আনন্দে ধারালো নখ দিয়ে কেবল আঁচড়ের-পর-আঁচড় টেনেছে। বেশ বোঝা গেল রাত্রের মধ্যে খুব একটা মারামারি কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি সভয়ে বিনুর দিকে চেয়ে বল্লুম—"বিনু দেখছিস!"

বিনু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমারই জন্যে তাসগুলো গেল!"

"আঁ! তোমারই জন্যে? তার মানে?—সেই চৌখুপি ঘর থেকে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে? তা হলে তো সবই ঠিক!"

কিন্তু বিনুর মুখ-দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। একটু ইশারা পাবার আশায় আমি বিনুকে আবার জিজ্ঞাসা করলুম—"কি ক'রে এমন হলো বিনু!" বিনু কোনো জবাব দিল না, শুধু আঙুল দিয়ে ভাঙ্গা আলমারিটা দেখিয়ে দিলে।

আমি আল্‌মারি খুলতেই একরাশ আরসোলা ফর্‌ফর্‌-ক'রে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। তারপর ডানা-মেলে উড়ে অন্ধকার কোণের একটা গর্ত দিয়ে কোথায় চলে গেল—বোধ হয় মাটির তলা দিয়ে সেই চৌখুপির মধ্যে। আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলুম।

বিনু বল্লে—"তাসগুলো কুড়ো!"

আমি তাসগুলো কুড়িয়ে, গুছিয়ে দেখি সবই আছে, কেবল একখানা নেই—সেই হরতনের গোলাম!

তবে?

এই তো ঠিক মিল্‌ছে! সেই হরতনের গোলাম—যাকে নিয়ে কাল

রাত্রের ঐ সমস্ত অদ্ভুত ঘটনার উৎপত্তি—সে নেই কেন। সে গেল কোথা ?

সে কোথায় আছে, আমি জানি। সে আছে সেইখানে—সেই চারিদিক-বন্ধ চৌখুপির মধ্যে, যেখানে সেই নয়-বছরেব সুন্দর ছেলেটি চিরদিন একা অন্ধকারে বসে আছে।

কালকেব সব কাণ্ড বিনু নিশ্চয় ভুলে গেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠে তার আব কিছুই মনে নেই। তার যে ঘুম। এমন তো আমারও এক-একদিন হয। বাতের ঘটনা স্বপ্ন-দেখার মতো সকালে সব ভুলে যাই। কাল বাত্রে আমি যদি ঘুমিয়ে পডতুম, তা' হলে আমিও হয়ত সব ভুলে যেতুম, আজ সকালে উঠে অবাক হয়ে ভাবতুম—তাই তো হরতনের গোলাম-বেচারা গেল কোথায ?

এক-রাতের ইতিহাস

গাঁয়ের রঘু চাটুয্যে বেঁচে থেকে সবাইকে যেমন জ্বালিয়ে ছিল, মরেও আমাদের ক'জনকে তেমনি জ্বালিয়ে গেল। তার মরা উচিত ফাঁসিকাঠে, কিন্তু সে মরল বিছানায় শুয়ে।

আজ ক'দিন ধ'রে বিষম বাদ্‌লা নেমেছে, মেঘের আড়ালে ডুব মেরে সুয্যিঠাকুর দিব্যি ঘুম দিচ্ছেন। থেকে থেকে বাজের গুড়গুড় নি,—তবে তা সুয্যিঠাকুরের নাক-ডাকার আওয়াজ বোধ করি নয়। দিন রাত বৃষ্টির কামাই নেই—কখনও মুষলধারে, কখনও টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে।

দিনেই চারিদিক ঘুটঘুট করছে, রাতের তো কথাই নেই। এই ভিজে অন্ধকার রাতে দুর্দান্ত রঘু চাটুয্যে হঠাৎ পটল তুলে বসল।

রঘুকে সবাই ভয় আর ঘেন্না করত। তার উপরে এই দুর্যোগ; আর শ্মশান হচ্ছে গাঁ থেকে চার মাইল দূরে। কাজেই মড়া পোড়াতে যেতে কেউই রাজি হ'তে চাইলে না।

নরকে নিয়ে যাবার সময়ে যমদূতেরা যদি রঘুর দেহটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে নরকের অগ্নিকুণ্ডে ফেলে দিত, আমরা তাহ'লে হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচতুম। কিন্তু তা যখন হ'ল না, তখন কি আর করি, রঘুর বুড়ী মায়ের কান্নাকাটি শুনে আমরা চারজনেই মড়া নিয়ে শ্মশানে যেতে রাজি হলুম।

টিপ্‌ টিপ্‌ ক'রে ইল্‌সেগুঁড়ি ঝরছে আর ঝরছেই, পথে প্যাচ্‌-

প্যাচ্ করছে কাদা আর চারিদিকে থম্-থম্ করছে মিশ্‌মিশে কালো রাত। একটা ভারি মড়া কাঁধে ক'রে আমাদের চারজনকে এই চার মাইল দুর্গম বনপথ পার হ'তে যে প্রাণান্ত-পরিশ্রম করতে হবে, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই।

বাড়ির বাইরে পা দিতে-না-দিতেই মাথার উপরকার বটগাছের ডাল থেকে চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে উঠল।

সেই অলক্ষুণে ডাক শুনে মধু খুড়ো 'হরিবোল, হরিবোল' ব'লে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগলেন।

মাধব বললে, "রোঘো আমাদের সহজে নিষ্কৃতি দেবে ব'লে মনে হচ্ছে না। আজকের রাতটা ভালোয়-ভালোয় কাটলে বাঁচি।"

মাণিক অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "রাম, রাম!"

আমি মুখে আর কিছু বললুম না।

রঘুর চাকর খ্যাঁদা লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে চলল, তার পিছনে পিছনে পিছল পথে খুব সাবধানে মড়ার খাট কাঁধে ক'রে আমরা অগ্রসর হলুম। এই খ্যাঁদা শুধু রঘুর চাকর নয়, সে ছিল তার সকল পাপ-কাজের সঙ্গী। তার চেহারা যেমন দুষ্‌মন, তার স্বভাবও তেমনি কুৎসিত। তার ঐ দুখানা কালো কালো হাত যে কত ডাকাতি, রাহাজানি আর চুরি-জোচ্চুরি করেছে, সে আর হিসেব ক'রে বলা যায় না। রঘু ছাড়া আর কেউ তাকে ভালোবাস্‌ত না।

গাঁ ছেড়ে মাঠে, তারপর বনের ভিতর দিয়ে পথ, তারপর আবার মাঠ, তারপর নদীর ধারে শ্মশান। কিন্তু আজকের ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে মাঠ আর বন, আকাশ আর পৃথিবী সব একসা হয়ে গেছে। তাদের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছিল শুধু মাঝে মাঝে জ্ব'লে-ওঠা বিদ্যুতের আলোয়।

খ্যাঁদার লণ্ঠনের আলো মিট্-মিট্ ক'রে জ্ব'লে অন্ধকারের নিবিড়তাকেই যেন আরো ভালো ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছিল।

মাঠ দিয়ে খানিক এগুবার পরেই পিছন থেকে মধু খুড়ো হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "আমার মনে হচ্চে, আমাদের পেছনে পেছনে কে যেন আসচে।"

খ্যাঁদা লণ্ঠনটা মাথার উপরে তুলে সেই ম্লান আলোর সাহায্যে পিছন-দিক্‌টা দেখবার চেষ্টা ক'রে বললে, "কৈ, কেউ তো নেই কর্তা!"

আমি বললুম, "খুড়ো, এই দুর্যোগে আর অন্ধকারে কে আর সখ ক'রে মাঠের মধ্যিখানে ভিজ্‌তে আর হোঁচট্ খেতে আসবে?"

মাধব বললে, "কারুকে আর ভূতে পায় নি তো!"

মাণিক শুক্‌নো গলায় বললে, "আঃ, আবার ও নাম কেন? রাম, রাম!"

মাঠ ছেড়ে বনে এসে পড়লুম। চলতে চলতে মনে হ'তে লাগল, বনের গাছপালার সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় অন্ধকারও যেন দোল খাচ্ছে! চল্‌তে চল্‌তে আমাদের সকলেরই গা ছম্ ছম্ করতে লাগল।

মধু খুড়ো ফের বললেন, "নিশ্চয় কেউ আমাদের পিছু পিছু আস্‌চে! এবারে আমি খুব কাছেই পায়ের শব্দ পেলুম!"

খ্যাঁদা আবার পিছন-দিকটা দেখে ঘাড় নেড়ে বললে, "কেউ নেই কর্তা!"

আমি বললুম, "ভুল শুনেচ খুড়ো!"

মাধব বললে, "ভুল না হ'তেও পারে। শুনেচি এই বনে ব্রহ্মদৈত্যের বাসা আছে!"

মাণিক মৃদু স্বরে বললে, "রাম, রাম!"

বনের মাঝখানে এসে কাঁধ থেকে খাট নামিয়ে আমরা একটু জিরুতে লাগলুম। হঠাৎ একদল শেয়াল কোথা থেকে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা ক'জন ছাড়া পৃথিবীতে যে আরো প্রাণী আছে, এতক্ষণ পরে তার সাড়া পাওয়া গেল। কিন্তু তারপরেই শুনতে পেলুম সেই অসময়ে বনের ভিতরে হেঁড়ে-গলায় কে গান গাইছে :—

"খাটে শুয়ে কে যায় রে, কে যায় রে,
কে যায় রে ওই !
পায়ে হেঁটে চ'লে আয়, ব'সে ব'সে
দুটো কথা কই !
বন ডাকে সোঁ সোঁ ক'রে,
মন গেছে আঁধি ভ'রে,
দুধু-ভাতি খাবি যদি কাছে আয়,
বলি পই-পই !"

—গানের আওয়াজ ক্রমেই আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে !

আমরা সবাই ভয়ে হরিবোল দিয়ে উঠলুম, মাণিক শুধু "রাম রাম" ব'লে চ্যাচাতে লাগল !

গান চল্‌ল :—

"পচা মড়া ভালো নয়,
পোকা কার পেটে সয় ?
বুড়ো-হাড়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে যেতে প'ড়ে
আমি রাজি নই !
ডালে উঠে রাত-দিন
নাচি আয় ধিন্-ধিন্

আর খালি গীত গাই,—নিয়ে আয়
গাছে-চড়া মই !
ব্যাঙাচীরা ডাক্‌বে না,
ফিঙে জেগে থাক্‌বে না,
এত রোদে ঘুরে ঘুরে হোস্‌ কেন
জলে-ভেজা খই !
ও মাম্‌দো ! ওরে পেঁচো !
কেন মিছে খাস কেঁচো ?
আকাশকে দে মাড়িয়ে পা বাড়িয়ে,
কর হই-চই !
খাবি খায় টিক্‌টিকি,
হাঁচি আসে ছাখ্‌ দিকি !
হাঁস-ফাঁস্‌ মরা হাঁস, কোথা যাস্‌—
চই-চই-চই !
ঠ্যাং চলে শুয়ে শুয়ে,
কার পোলা পেসে পুঁয়ে ?
পাতে মোর কাঁচা মাথা দিবি নাকি ?
বেশ, তাই সই !
খাটে শুয়ে কে যায় রে, কে যায় রে,
কে যায় রে ওই !”

—একি অদ্ভুত গান ! এ কি ভয়ানক সুর ! তাড়াতাড়ি মড়ার খাট নিয়ে শ্মশানের দিকে ছুটে চললুম !

শ্মশানে এসে খাট নামিয়ে আগে খুব-খানিকটা হাঁপিয়ে নিলুম।

তারপর মাধব বললে, "বনের ভেতর যে গান গাইছিল সে মানুষ নয়।"

মধু-খুড়ো বললেন, "নরক থেকে রঘুর স্যাঙাতরা বোধ হয় তাকে আগ্‌বাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেচে!"

রঘুর চাকর খ্যাঁদা রেগে খুড়োর দিকে কট্‌মট্‌ ক'রে তাকিয়ে রইল।

মাণিক এত ভয় পেয়েছিল যে, কথা চুলোয় যাক্ তার মুখ দিয়ে আর "রাম রাম" শব্দ পর্যন্ত বেরুল না?

আমি বললুল, "ও-সব বাজে কথা থো কর। এখন জঙ্গলে গিয়ে আবার কাঠ কেটে আনতে হবে।"

মধু-খুড়ো বললেন, "অদৃষ্টে আজ অনেক কষ্টই আছে। এই ক'দিনের বর্ষায় ভেজা কাঠ দিয়ে কি ক'রে যে চুলি জ্বালব, তা জানি না।"

আমি বললুম, "তবু চেষ্টা তো করতে হবে! নাও, উঠে পড়!"

মাণিক বললে, "আমি আর কোথাও যাচ্চি না!"

—"তবে তুমি এখানেই থাকো।"

—"একলা?"

—"কাজে-কাজেই!

—"ওরে বাপ্‌রে! একলা বসে আবার যদি সেই গান শুনতে পাই, তা'হলে আমি আর বাঁচব না।······খ্যাঁদা আমার সঙ্গে থাক্।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই করতে হ'ল। আমি, মধু-খুড়ো আর মাধব লণ্ঠন আর কুড়ুল নিয়ে জঙ্গলের ভিতরে কাঠ কাটতে চললুম।

অন্ধকারের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে আকাশ তখনো ক্রমাগত জল ঢেলে যাচ্ছিল। আমাদের ডানদিকে অদৃশ্য নদী বয়ে যাচ্ছে,—তার

জলকল্লোল শোনাচ্ছে ঠিক যেন ডাইনির কান্নার মতন। বাঁ-দিকে এক-মাঠ ভরা অন্ধকারের ভিতর থেকে বাতাসের হাহাকার শোনাচ্ছে, যেন কোন মরো-মরো রোগীর আর্তনাদের মতন। পিছনে শ্মশান,—তার বুকে চেপে ব'সে কাল-রাত্রির স্তব্ধতাও যেন আজ ডুক্‌রে ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌ছে।

আচম্বিতে এক্‌দল শেয়ালও আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল,—সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, একটা মানুষের মূর্তি মাঠের অন্ধকার ভেদ ক'রে একেবারে আমাদের সামনে আবির্ভূত হ'ল। বেজায় ঢ্যাঙা আর লিকলিকে সরু তার দেহ। একরাশ পাকা গোঁফ-দাড়ী আর তিন-চার হাত লম্বা জটায় ঘেরা মুখের ভিতরে খুব বড় বড় ড্যাব্‌ডেবে চোখদুটো যেন দপ্‌দপিয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে!

লোকটা আমাদের দিকে ফিরেও তাকালে না, হন্ হন্ করে শ্মশানের দিকে এগিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি চুপি চুপি বললুম, "পাগল!"

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে মাধব বললে, "ভূত! ভূত! ব্রহ্মদৈত্য!"

মধু খুড়ো সভয়ে বললে, "চুপ, চুপ! ঐ শোনো!"

আবার সেই গান!—

"ঠ্যাং চলে শুয়ে শুয়ে,
কার পোলা পেলে পুঁয়ে?
পাতে মোর কাঁচা মাথা দিবি নাকি?
বেশ, তাই সই!"

প্রত্যেকে এক এক বোঝা কাঠ ঘাড়ে ক'রে আবার শ্মশানের দিকে ফিরলুম।

মধু খুড়ো বললেন, "শ্মশানের দিকে যেতে আর পা উঠচে না। যদি ফের সেই মূর্ত্তির সঙ্গে দেখা হয়?

মাধব বললে, "কাজ নেই আর শ্মশানে গিয়ে। চল আমরা এইখান থেকেই পালাই চল!"

আমি বললুল, "তাও কি হয়? শ্মশানে আমাদের লোকেরা যে ব'সে আছে!"

মধু খুড়ো হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "শ্মশানে তারা কি আর এতক্ষণ আছে? গিয়ে দেখ্‌বে, তারা কোন্ কালে লম্বা দিয়েচে, আর সেই মূর্তিটা দিব্যি আরামে দু পা ছড়িয়ে ব'সে রঘুর মড়া চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্চে!"

আমি বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, "পাগলের মতন যা তা বোকোনা খুড়ো!"

হঠাৎ আবার গান শোনা গেল :—

"ডালে উঠে রাত-দিন
নাচি আয় ধিন্-ধিন্
আর খালি গীত গাই,—নিয়ে আয়
গাছে-চড়া মই!"

আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম!

শ্মশানের দিক থেকে আসছে—এবারে আর একটা নয়, দু-দুটো মূর্তি!

প্রথম মূর্ত্তিটার মুখের পানে তাকিয়েই আমার বুকের কাছটা যেন হিম হয়ে গেল! এ যে রঘু চাটুয্যে,—যার মড়া আমরা কাঁধে ক'রে শ্মশানে বয়ে এনেছি!—হাঁ, রঘু—রঘু—এ রঘু ছাড়া আর কেউ নয়!

—আর রঘুর পিছনে পিথনে চলেছে পোষা কুকুরের মতন, তার চাকর খ্যাঁদা! দেখতে দেখতে অন্ধকারের ভিতরে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল!

ছুটতে ছুটতে তিনজনে আবার শ্মশানে এসে পড়লুম। দেখলুম, মড়ার খাটের পাশে ব'সে একলা মাণিক বলির পাঁঠার মত কেঁপে কেঁপে মরছে!

মধু-খুড়ো তাড়াতাড়ি সুধোলেন, "মাণিক, মাণিক ব্যাপার কি?"

আধ-মরার মতন ধুঁকতে ধুঁকতে মাণিক বললে, "কিছু জানি না খুড়ো, আমি আর এখানে থাকব না! আবার সেই গান শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম। জ্ঞান হয়ে দেখি, আমাকে এখানে একলা ফেলে খ্যাঁদা-রাস্কেল লম্বা দিয়েচে!

খাটের উপরে কাপড়ে ঢাকা মড়া তো ঠিকই রয়েছে! তবে কি আমরা যা দেখেছি তা চোখের ভুল।

মধু-খুড়ো এক টানে মড়ার কাপড়খানা সরিয়ে দিলেন। সবিস্ময়ে দেখলুম, খাটের উপরে মড়া আছে বটে; কিন্তু তা রঘু চাটুজ্জের নয়!—এই খানিক আগে মাঠের ভিতর যে জটা-দাড়ীওয়ালা, রোগা ও ঢ্যাঙা মূর্তিটাকে দেখেছিলুম এটা হচ্ছে তারই দেহ,—ম'রে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে খাটের উপরে প'ড়ে রয়েছে!

আমরা সবাই এক সঙ্গে আর্তনাদ ক'রে শ্মশান থেকে পলায়ন করলুম!

বাড়িতে ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম।

শেষ-রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, বিছানার উপরে উঠে ব'সে শুনলুম, সদর-দরজার কড়া নাড়তে নাড়তে আমার নাম ধ'রে কে তীক্ষ্ণস্বরে ডাকছে—"অবনী! অবনী! অবনী!"

এই অসময়ে কে আবার জ্বালাতে এল ? বিরক্ত হয়ে ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসেই শুনলুম, পথের উপরে দাঁড়িয়ে কে গান গাইছে :—

“খাবি খায় টিকটিকি
আসে হাঁচি দ্যাখ্ দিকি !
হাঁস্ ফাঁস্ মরা হাঁস্, কোথা যাস্—
চই-চই-চই !”

শিউরে উঠে আবার ঘরে ঢুকে আবার দরজায় খিল লাগিয়ে দিলুম !

পরদিন সকালেই খবর পেলুম, মধু-খুড়ো, মাধব আর মাণিকের নাম ধ'রেও কাল শেষ-রাতে কে ডেকে ঐ গান গেয়েছিল ! বলা বাহুল্য, তারা কেউই সাড়া দেয় নি !

রঘু চাটুয্যে আর খ্যাদারও কোন খবর পেলুম না। তাদের সঙ্গে আর দেখা হয়-নি—না হওয়াই ভালো।

ভুতুড়ে খাদ

এক কলিয়ারী থেকে আর এক কলিয়ারীতে বদ্‌লি হয়ে এসেছি।

কয়লা-কুঠির ডাক্তার। ভারি ঝক্‌মারি কাজ। খাদের কুলি-কামিন থেকে আরম্ভ ক'রে ম্যানেজার-সাহেব পর্যন্ত—যে যেখানে আছে, সকলেরই জীবন মরণ যেন আমারই হাতে। আমি যেন তাদের বিধাতা। কারও পায়ে একটুখানি আঁচড় লেগেছে—ডাক্ ডাক্তারকে। কোথাও কোনও কুলিধাওড়ায় হয়ত' রুগী মরছে,—ডাক্ ডাক্তারকে! খাদের নীচে কুলি মরেছে—সকলের আগে আমাকেই সেখানে ছুটতে হবে।—সে যাই হোক্, চাক্‌রি করতে এসে সে দুঃখু ক'রে লাভ নেই!

বাসাটি মন্দ নয়। টালি দেওয়া খান চারেক ঘর, সুমুখে দাওয়া উঁচু ছোট একটুখানি রক, রকের নীচেই উঠোন, উঠোনে রান্নার জায়গা।

চারিদিক ফাঁকা। ভাবলাম, ভালোই হ'লো। আগে যে কলিয়ারীতে ছিলাম,—প্রকাণ্ড কলিয়ারী, ছোটখাটো একটা শহর বললেই হয়, চারিদিকে ধোঁয়া আর বস্তি, দম যেন আটকে আসতো। এখানে তা হ'লেও একটুখানি নিশ্বাস নিয়ে বাঁচব।

ম্যানেজারবাবু বাঙ্গালী। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। প্রথম এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয়টা জমিয়ে রাখা ভালো। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন তার বাঙলোর দিকেই যাচ্ছিলাম। কালোরঙের ভুঁড়িওয়ালা বেঁটে এক ভদ্রলোক আমায় দেখে নমস্কার করে' পথের

মাঝে থমকে দাঁড়ালেন। গোঁফগুলি নীচের দিকে বেঁকে আছে। মুখের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই নতুন ডাক্তার, না ? আমি হেড্ ক্লার্ক।"

কি আর বল্‌ব, ঘাড় নেড়ে একটুখানি হেসে নমস্কার ক'রে এগিয়ে যাচ্ছি, তিনি আমার পিছু নিলেন। বললেন, 'চলুন তবে ওই দিক দিয়েই যাই, আপনার সঙ্গে গল্প করাও হবে।'

বলেই তিনি নিজের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এখানে চাকরি করছেন প্রায় দশ বছর, অথচ একটি দিনের জন্যেও তিনি কামাই করেননি। বাড়ি তাঁর বেশি দূরে নয়। এখান থেকে মাইল খানেকের মধ্যেই একটা গ্রামে। সন্ধ্যার আগেই রোজ তাঁকে বাড়ি পৌছোতে হয়।

কোনও কথাই তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবু তিনি আমায় সাবধান করে' দিলেন! বললেন, 'দেখুন, এখানকার নিয়মই হচ্ছে তাই। আপনিও যেন সন্ধ্যের পর আর বাসা থেকে বেরোবেন না। নতুন মানুষ,—জানেন নাত', তাই সাবধান ক'রে দিলাম।

বললাম, 'কেন ?'

বলতেই তাঁর সেই কালো গোঁফের জঙ্গল ভেদ ক'রে পানে-রাঙা লাল-লাল কয়েকটি দাঁত্ বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম তিনি একটুখানি হাসলেন।

বললেন, 'জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই বড় ভীষণ জায়গা মশাই। আপনি ভূত বিশ্বেস্ করেন ?'

বললাম, 'না ?'

'এই মরেছেন। চারিদিকে ভূত মশাই, কলিয়ারীটা ভূতে ভূতে একেবারে ছেয়ে গেছে। সন্ধ্যে হ'লে এ তল্লাটে আর জন মনিষ্যি দেখতে পাবেন না খাদের নীচে দিনের বেলাতেই লোকজন নামতে ভয় করে;

রাত্রের রাজত্ব একরকম উঠেই গেছে। অন্ধকার রাত্রে এক একদিন দেখবেন কি ভীষণ ব্যাপার। ঘরে বসেই হয়ত শুনতে পাবেন, ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে, খাদ চলছে, ঘণ্টা বাজছে, ট্রাম লাইনের উপর ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ক'রে কয়লার গাড়ি ঠেলার শব্দ পাচ্ছেন, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখুন,—সব চুপ! কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যেয় হয়ত' দেখলেন, ডিপোয় কয়লার একটি গুঁড়ো পর্যন্ত নেই, সকালে গিয়ে দেখুন—চার-পাঁচ ওয়াগন্ কয়লা গাদা হয়ে গেছে।

বললাম, 'তা হলেত' ভালই বলতে হবে। ভূতগুলো খুব উপকারী বলুন!'

ভদ্রলোক আবার তেমনি দাঁত বের করে একবার হাসলেন বললেন, 'তা' বললে হবে কি, খুন জখম যে লেগেই আছে। এমন মাস গেল না যে, খাদের নীচে দু'চারটে খুন না হচ্ছে। আগে মশাই যা কিছু হ'তো—ওই খাদের নীচেই হ'তো, গত দু'বছর ধরে ভূতগুলো দেখছি ওপরেও উঠে এসেছে। এই ধরুন, আমার আপিসের খাতাপত্র! আজ ঠিক যেমনটি রেখে চাবি বন্ধ ক'রে দিয়ে এলাম, কাল এসে দেখব—সব ওলট্-পালট্ হ'য়ে গেছে—এখানকার জিনিস্ ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে,—একেবারে তছ্‌নচ্‌ কাণ্ডকারখানা। তবে নষ্ট কিছু করে না—এই যা! আজকাল আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।'

হেসে জিজ্ঞেস্ করলাম, 'তাই বুঝি বেলা থাকতে থাকতে আপনাকে বাড়ি পৌছোতে হয়?'

ঘাড় নেড়ে ভদ্রলোক জানালেন, 'নিশ্চয়, একদিন যে-কাণ্ড ঘটেছিল মশাই, শুনলে আপনার গা-হাত-পা শিউরে উঠবে। থাক্, আজ আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে,—আর একদিন বলব। এখন চলি। নমস্কার।' বলেই তিনি তাঁর হাত দু'টি তুলে আমায় আর একটি নমস্কার ক'রে ডানদিকে রাস্তা ভাঙলেন।

ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে সেদিন আমার অনেক কথাই হ'লো। বললাম, 'ভূতের কথা কি সব শুনছি আপনার কলিয়ারীতে,—একি সত্যি ?'

ম্যানেজারবাবু হাসলেন। বললেন, 'শুনেছেন এরই মধ্যে ?'

বললাম, 'শুনেছি, কিন্তু ভূত আবার কি ? আমার তো বিশ্বাস হয় না কোনোদিন।'

ঘাড় নেড়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'কিছু নয়। তবে খাদের অবস্থা বড় খারাপ। চালগুলো অত্যন্ত নরম। খুব সাবধানে কাজ করতে হয়, নইলে কয়লা কাটতে গিয়ে চাল থেকে পাথর খসে পড়ে; লোকজন প্রায়ই মারা যায়।'

কিছুদিন আগে—না কিছুদিন আগে কেন, অনেকদিন আগে, আমি তখন এখানে ছিলাম না। সিপারন নদীতে সেবছর ভয়ানক বান্ হয়। বানের জল এত বেশি বেড়ে ওঠে যে হঠাৎ একদিন দেখতে না দেখতে বান্ এসে পড়ে—খাদের মুখে। 'চানকের' পথে হুড়্ হুড়্ ক'রে জল ঢুক্‌তে থাকে। তাকে আর রুখ্‌বে কে ? দিনের বেলা। খাদের নীচে তখন কাজ চলছে। লোকগুলোকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু দুদিন ধরে ক্রমাগত জল ঢুকেছে, তিন দিনের দিন বান্ যখন কম্‌লো, খাদ তখন ভর্তি হয়ে গেছে। 'পাম্প' দিয়ে জল তুলে তুলে অনেক কষ্টে নীচে নেমে গিয়ে দেখা গেল—প্রায় পঞ্চাশ জন লোক খাদের যেখানে সেখানে ম'রে পড়ে রয়েছে। বাস্, সেই থেকে লোকের ধারনা হলো যে, অতগুলি লোক এক সঙ্গে যেখানে মারা যেতে পারে, ভূত সেখানে আছেই।' এই ব'লে তিনি খুব জোরে জোরে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু কেবলই আমার মনে হতে লাগলো—আহা, অতগুলো মানুষ কোনোদিক থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে

নিতান্ত অসহায়ের মত হাহাকার ক'রে জলে ডুবে মারা গেল,—কারও হয়ত বুড়ো বাপ-মা আছে খাদের ওপরে কুলি ধাওড়ায়, কারও ছেলে, কারও মেয়ে কারও স্ত্রী, কারও স্বামী পুত্র—আহা। চুপ করে ভাবতে গিয়ে মুখের হাসি আমার মুখেই মিলিয়ে গেল,—সে করুণ দৃশ্য যেন আমি আমার চোখের সুমুখে দেখতে পেলাম।

গল্প করতে করতে সন্ধ্যা হ'লো ম্যানেজার বাবুর চাকর আমাদের কাছে লণ্ঠন দিয়ে গেল। উঠতে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'একটু চা খেয়ে যান।'

চা খেয়ে তাঁর কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম, রাত্রি তখন আটটা।

ম্যানেজারবাবু বললেন, "আলো নিয়ে চাকরটা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসুক।"

ভাবলাম, তিনি ভেবেছেন হয়ত' ভূতের ভয়ে রাস্তায় যদি আমার আবার কিছু বিপদ আপদ হয়। হেসে বললাম, 'না, কিছু দরকার নেই। ভূতের ভয় আমি করি না।'

তিনিও হেসে আমায় নমস্কার ক'রে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিলেন।

ফটক পেরিয়ে বাইরে পথে এসে দাঁড়ালাম, দেখি অন্ধকারে তখন চারিদিক থম্ থম্ করছে, কোথাও জন মানবের সাড়া শব্দ নাই। মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আকাশটা যেন তারায় ঠাসা। তারই একটুখানি ঝাপ্‌শা আলোয় পথের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম।

বাসাটা আমার নেহাৎ কাছে নয়। পথের পাশে দুতিনটে কুলি ধাওড়া পেরিয়ে গিয়ে আম-কাঁঠালের একটি বাগান, তারপরেও খানিকটা কালো কয়লার গুঁড়ো দিয়ে তৈরী ছোট একটি পথ, তারই

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বাঁহাতি একটা পোড়ো বাড়ির মত ভাঙ্গা বাড়ি; সেইখান থেকে ডানদিকে একটা নিম গাছের তলা দিয়ে মিনিট-দুই হাঁটলেই আমার বাসার দরজায় গিয়ে পৌঁছাব।

কি যেন ভাবতে ভাবতে আমি সেই বাগানের ভিতর সরু একফালি পায়ে চলা পথের উপর দিয়ে চলেছি। মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে আমার পিছনের কুলি ধাওড়ায় সেই যে একটা কুকুর চেঁচাতে আরম্ভ করেছে, তার চীৎকার তখনও থামেনি, হঠাৎ দেখি, কয়েকটা গাছের তলা দিয়ে শুক্‌নো পাতার ওপর খড়মড় শব্দ করতে করতে মস্ত লম্বা কালোরঙের একটা লোক আমার সুমুখে এসে দাঁড়ালো। আচম্‌কা অন্ধকারে সত্যিই আমি একটুখানি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস্ করতে যাচ্ছি, তার আগেই লোকটা আমার আরও একটুখানি কাছে সরে এসে বললে, 'ডাক্তারবাবু, তুঁই একবার আয় আমার সঙ্গে।'

লোকটা বোধ হয় সাঁওতাল। বললাম্ 'কেন?'

সে বললে, 'ছেলেটাকে আমার বাঁচাতে হবেক্ ডাক্তার। তুঁই যদি না যাবি ত' ছেলেটা মরে যাবেক্—তুঁই আয়।'

'কি হয়েছে তোর ছেলের?'

বললে, 'তা জানিনা বাবু, তুই দেখবি চল্, আবার তুকে আমি ঘরের কাছে দাঁড়াই দিয়ে যাব।' গলার আওয়াজ শুনে মনে হলো লোকটা এক্ষুনি হয়ত কেঁদে ফেলবে। আমি আর 'না' বলতে পারলাম না। বললাম 'চল্।'

বাগান পেরিয়ে আমরা আর একটা রাস্তা ধরলাম। সে আমার আগে আগে চলতে লাগলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোর নাম কি?'

বললে 'আমার নাম টুইলা মাঝি।'

বললাম, 'কতদূর যেতে হবে?'

হাত বাড়িয়ে কাছেই কয়েকটা খড়ো ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললে 'ওইখানে।'

চুপ ক'রে পথ আর কত চলি, তার সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলাম। 'খাদে বুঝি তুই কয়লা কাটিস্?'

'হঁ বাবু।'

'কটি ছেলে তোর?'

'ওই একটি।'

'ছেলেটি কত বড়?'

'তা অনেক্ বড় বটে।'

'তবু—ক বছরের?'

"কে জানে তা! অতসব জানি না।"

এমনি সব নানান্ কথা কইতে কইতে পথ আমরা চলেছি ত' চলেইছি। সামনে হাত বাড়িয়ে যে ঘরগুলো সে আমায় দেখিয়েছিল, যতই এগিয়ে যাই, মনে হয় সেগুলো আরও দূরে। বললাম, 'একি রে টুইলা, কাছে বলেছিলি যে!'

টুইলা বললে, 'হঁ বাবু, কাছে লয় ত কী?' কিন্তু পথ যেন আর ফুরোয় না।

সময় কাটাবার জন্যে আবার কথা সুরু করলাম। 'ছেলেটার তোর কি হয়েছিল প্রথমে?'

টুইলা চুপ করে রইলো।

'প্রথমে হয়েছিল কি? হাঁরে?'

টুইলা যেন বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে। বললে 'খাদে বান্ ঢুকেছিল।'

'বান! হঠাৎ আমার ম্যানেজারবাবুর সেই বানের কথাটা মনে পড়লো। বললাম, 'কখন রে? সে-ত' অনেকদিন—'

টুইলা বললে,—'হুঁ- এনেক দিন।'

বললাম 'তারপর ?'

'তারপর—আমরা তেখন এনেক লোক ছিলম খাদের ভিতরে—কয়লা কাট্‌ছিলম্।'

বললাম, 'সেখান থেকে কেউ ত' বাঁচেনি শুনলাম, তুই বাঁচলি কেমন করে' ?

টুইলা আর জবাব দেয় না।

এবার আমার কেমন যেন মনে হলো। বললাম 'হাঁরে টুইলা, শুনছি নাকি এখানে খুব ভূতের ভয়। সত্যি নাকি ?'

হঠাৎ দেখি টুইলা নেই। অন্ধকারে, ভাবলাম, কালো মানুষ, হয়ত' খানিকটা এগিয়ে গেছে তাই দেখতে পাচ্ছি না। ডাক্‌লাম,—'টুইলা'।

কোথায় টুইলা !

এদিক্ ওদিক্ আগে পাছে তাকিয়ে দেখি, টুইলা কোথাও নেই। চারিদিকে দিকচিহ্নহীন অন্ধকার। আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার, ডাক। মাথার ভেতরটা চন্ ক'রে উঠলো। সমস্ত শরীরের রক্ত তখন আমার জল হয়ে গেছে।

পিছন ফিরে ছুট্‌বার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ছুটে আমি যাব কোথায় ? চীৎকার করলেই-বা কে শুনবে !···ভাবলাম, মৃত্যু অনিবার্য। চলতে গিয়ে দেখি, পা দু'টো আড়ষ্ট, গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে কতক্ষণ যে চলেছি কিছুই আমার মনে নেই, রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে চারিদিক যখন ফর্সা হচ্ছে, দেখি, তখনও আমি পথ চলছি। শরীরে তখন আমার শক্তি নেই, পায়ে জোর নেই, নিতান্ত কেমন যেন মরিনি বলেই বেঁচে আছি—এমনিই

আমরা খাদের নীচে নেমে গেলাম। এবার আমাদের সঙ্গে আর বেশি লোক গেল না। যেতে চাইলও না। ম্যানেজারবাবু হেঁসে বললেন, 'পুলিশ যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে, আর ভাবনা কি? ভূতেরও ত' পুলিশের ভয় আছে?'

ম্লান হাসি হেসে নেমে ত' গেলাম! যা থাকে কপালে। একে রাত্রির অন্ধকার, তায় আবার কালো কয়লার সেই পাতালপুরী চারিদিক কালো! তবে আমাদের সঙ্গে আলোও ছিল প্রচুর। প্রত্যেকের হাতেই একটি করে' সেফ্‌টি ল্যাম্প। পুলিশের ইন্সপেক্টরের হাতে টর্চ।

আগে আগে যাচ্ছে মালকাটার সর্দার। কিন্তু গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড।

মৃতদেহ সেখানে নেই। খালি খানিকটা রক্তের দাগ কালো কয়লার ওপর জমাট বেঁধে রয়েছে দেখলাম। এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দাঁড়িয়ে আছি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ। খাদের চাল থেকে কোথাও বা খুট্‌খুট্ করে' ছোট ছোট কয়লার টুক্‌রো খসে' খসে' পড়ছে' কোথাও বা টুপ্‌টুপ্ করে জল পড়ার শব্দ পাচ্ছি। কি করা যায়?

ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, 'আসুন, এদিক-ওদিক খোঁজ করে দেখি, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

বিশ্বাস তাঁর না হবারই কথা। কিন্তু আমরা আর না বিশ্বাস করে' যাই কোথায়। এর আগের বারেও ত' এম্‌নি হয়েছিল।

খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলাম। ইন্সপেক্টরবাবু বেশ সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে তিনিই সবার আগে আগে চললেন। সবার পেছনে যেতে আমার ভয় করছিল। কোনোরকমে পাশ কাটিয়ে

কৌশল করে কাউকে জানতে না দিয়ে ফস্ ক'রে' আমি এক সময় মাঝে গিয়ে ঢুকলাম।

খোঁজার আর অন্ত রইল না। কিন্তু লাশ আর পাওয়া যায় না।

খুব ছোট একটা সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে চলেছি, হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার। ভয়ানক একটা কিছু অপঘাত ঘটলে মরবার আগে মানুষ যেমন ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে,—এও যেন ঠিক তেমনি একটা গোঙানির শব্দ। একেবারে ইন্সপেক্টর বাবুর পায়ের কাছে। আমরা ত' সব চমকে উঠে শিউরে খানিকটা পিছু হাটতে গিয়ে এ-ওর গায়ে গায়ে লাগালাম ধাক্কা। ভয়ে ত' আমি ম্যানেজারবাবুকে তখন জড়িয়ে ধরেছি। সর্বাঙ্গ শিব্‌শিব ক'রে গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে। গেলাম আর কি। বাঁচবার আর কোনও আশা নেই।

ইন্সপেক্টরবাবু ত' অত সাহসী লোক। টর্চের আলো ফেলে যেমনি নীচের দিকে তাকিয়েছেন—দেখেন, মৃতদেহের বুকের ওপর পা দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে।

'বাপ্!' ব'লে' তিনি লাফিয়ে একেবারে উলটে এসে পড়লেন আমার ঘাড়ে। আমি পড়লাম ম্যানেজারের গায়ে, ম্যানেজার দিলেন একটা কনেষ্টবলের পা মাড়িয়ে। এমনি করে সবাই মিলে আমরা হুটোপুটি করছি, এমন সময়—অবাক্ কাণ্ড। ইন্সপেক্টরের হাতের টর্চ গেল নিবে, অনেক টেপাটেপি করেও কিছুতেই আর জ্বালানো গেল না। তার পরেই একে একে আমাদের প্রত্যেকের হাতের আলোগুলো নিব্‌তে আরম্ভ করল।

প্রাণের আশা তখন একেবারেই ছেড়ে দিলাম।

কাঠ হয়ে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করলাম—যেমন করে হোক্ দেশলাই জ্বেলে জ্বেলে সুড়ঙ্গের দেওয়াল ধ'রে' চলুন্ আমরা ফিরে

যাই। এমন করে এখানে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে পালিয়ে যাওয়াই ভালো।

সর্দার বললে 'চল্ আমি পথ চিনি। দে, একটো জ্বালা কাঠির বাস্কো দে আমার হাতে।'

আমার পকেটে দেশলাই ছিল, কাঁপতে কাঁপতে সেটা বের ক'রে সর্দারের হাতে দিলাম।

কিন্তু ফস্ ক'রে সর্দার যেই একটা কাঠি জ্বেলেছে, তারই সেই সামান্য আলোতে দেখলাম, কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মত কালো কুচ্কুচে এক সাঁওতাল এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের সুমুখে। লম্বা লম্বা হাত দুটো বাড়িয়ে সে আমাদের সুড়ঙ্গের পথ আগ্লে বলে উঠলো—'যাবি কুথা? ছেলেকে আমার বাঁচা এগুতে, তা বাদে যাবি।'

ইন্সপেক্টরের পকেটে ছিল রিভল্ভার, চট করে সেটা বের করে' তিনি ধাঁ করে' চালালেন এক গুলি। ভীষণ আওয়াজে কানে আমাদের তালা লেগে গেল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলাম, অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ইন্সপেক্টর চীৎকার করে' উঠলেন—'গেলাম। গেলাম। ওরে বাবারে। ছেড়ে দে বাবা ছেড়ে দে।'

ভূতে মানুষে মারামারি। ইন্সপেক্টরের গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে আমাদের কাছ থেকে খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। ঝট্পট্ ঝট্পট্ করতে করতে সব থেমে গেল। শুন্লাম সাঁওতালটা বলছে, 'গুলি চালাবি আর? চালা দেখি কেমন মরদ।'

আমরা তখন পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ঠক্ঠক্ ক'রে কাঁপছি! 'আমাকে মেরেছিস্ বানে ডুবোই, জলের ভিতর ঠিক ইঁদুর-মারা করে'। ছেলেটা ছিল, আবার তাথেও মেরে দিলি!'

বলতে বলতে সাঁওতালটা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। 'কই তুদের ম্যানেজার কই ?'

ম্যানেজারবাবু কেঁদে ফেললেন, 'দোহাই বাবা, আমায় ছেড়েদে বাবা, আমার কোনও দোষ নেই।'

'আচ্ছা তুখে না হয় ছেড়ে দিলম্, কই ডাক্তারটো কুই ?' ব'লেই হাত বাড়িয়ে টপ করে' আমার ঘাড় ধরে' বললে, 'আয়, ছ্যাখ্ যদি তুই বাঁচাতে পারিস্।'

আমার তখন দম্ আট্‌কে এসেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। গোঁ গোঁ করছি।

* * * * *

তারপর কেমন করে যে ওপরে উঠে এসেছি, কেমন করে যে বাড়ি এসে পৌছেছি কিছুই জানিনে।

চাক্‌রি ছেড়ে দেবো বলে দরখাস্ত ত' আগেই করেছি, জবাব এলো কিনা জান্‌বার জন্যে বেলাবেলি ত' গেলাম সেদিন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

গিয়ে শুনি, অদ্ভুত ব্যাপার। কাল রাত্রি থেকে ম্যানেজারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। খাদের নীচেও না, খাদের ওপরেও না!

সর্বনাশ! সর্বাঙ্গ আমার শিউরে উঠলো।

তাহ'লে তিনি গেলেন কোথায় ?

মেডেল

কয়েক-বছর পূর্বে এ-ঘটনা ঘটেছে, তাই এখন মাঝে মাঝে আমার মনে হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে; আমারও কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার দরুণ হয়তো চোখের ভুল দেখে থাকবো বা ওই রকম কিছু—কিন্তু আমার মন বলে তা নয়, ঘটনাটি মিথ্যা ও অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। তবে আমার তখনকার অভিজ্ঞতাই সত্যি, এখন যা ভাবছি তাই মিথ্যে।

ঘটনাটি খুলে বলা দরকার।

প্রসঙ্গক্রমে গোড়াতেই এ-কথা বলে রাখি যে, গত দশ বৎসরের মধ্যে আমার শরীরে কোনো রোগ-বালাই নেই, আমার মন বা মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ আছে এবং যে সময়ের কথা বলছি, এখন থেকে বছর-চারেক আগে, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল।

আমার স্কুল-মাস্টারের জীবনে অত্যাশ্চর্য বা অবিশ্বাস্য ধরনের কখনও কিছু দেখিনি। অন্য পাঁচজন স্কুল-মাস্টারের মতই অত্যন্ত সাধারণ ও একঘেয়ে রুটিন-বাঁধা কর্তব্যের মধ্যে দিয়েই দিন কাটিয়ে চলেছি আজ বহু বৎসর।

সে বছর বর্ষাকালে, গরমের ছুটির কিছু পরে একদিন ক্লাসে পড়াচ্ছি, এমন সময় একটি ছেলে আর একটি ছেলের সঙ্গে হাত-কাড়াকাড়ি করে কি-একটা কেড়ে বা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করচে, আমার চোখে

পড়লো। আমি ওদের দু'জনকে অমনোযোগিতার জন্যে ধমক দিতে, অন্য একটি ছেলে বলে উঠলো—স্যর, কামিক্ষে সুধীরের মেডেল কেড়ে নিচ্চে—

—কার মেডেল? কিসের মেডেল?

সুধীর নামে ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—আমার মেডেল স্যর!

অন্য ছেলেটীর দিকে চেয়ে বল্লুম—ওর মেডেল তুমি নিচ্ছিলে, কামিক্ষে?

কামিক্ষে ওরফে কামাখ্যাচরণ মৌলিক নামে ছেলেটি বললে—নিচ্ছিলাম না স্যর, দেখতে চাইছিলাম; তা ও দেবে না।

—ওর মেডেল যদি ও না দেয়, তোমার কেড়ে নেবার কি অধিকার আছে? বোসো। ও-রকম আর করবে না—

কথা-শেষ করে সুধীরের দিকে চেয়ে ক্লাসের ছেলেদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সখ্য থাকার ঔচিত্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দেবার পরে, ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম—কই, কি মেডেল দেখি? কোথায় পেলে মেডেল?

ভেবেছিলাম আজকাল কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে-সব ব্যাডমিণ্টন খেলা, সাঁতারের বা দৌড়ের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তারই কোনো কিছুতে সুধীর হয়তো চতুর্থস্থান বা ওই ধরনের কোনো সাফল্য লাভ করে ছোট্ট এতটুকু একটা আধুলির মত মেডেল পেয়ে থাকবে—এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে, সে সেটা ক্লাসে এনে পাঁচজনকে গর্বভরে দেখাতে চাইবে; এমন কি এই ছুতো অবলম্বন করে ক্লাসশুদ্ধ ছেলে হেড্‌মাস্টারের কাছে দলবদ্ধ হয়ে গিয়ে এক বেলার জন্যে ছুটিও চাইতে পারে। সুতরাং মেডেলটা যখন আমার হাতে এসে পৌছুলো, তখন সেটাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই হাতে পেতে নিলাম; কিন্তু মেডেলটার

দিকে একবার চেয়ে দেখেই চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম। না, এতো পাড়ার ব্যাডমিণ্টন ক্লাবের বাজে মেডেল নয়, মেডেলটা পুরোনো, বড় ও ভারী, চমৎকার গড়ন !

—কি জিনিস দেখি !

মেডেলের গায়ে কি লেখা রয়েচে, আধ-অন্ধকার ক্লাসরুমে ভাল পড়তে পারলুম না—ও-পিঠ উল্টে দেখি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার অল্প-বয়সের মূর্তি খোদাই-করা।

পকেটে চশমা নেই, মনে হোল আপিস্-ঘরের টেবিলে ফেলে এসেচি। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছেলে ভিড় করেচে আমার চেয়ারের চারিপাশে—মেডেল দেখবার জন্যে।

তাদের ধমক দিয়ে বললুম—যাও বোসোগে সব—ভিড় কোরো না এখানে।

একটা ছেলেকে বললুম—কি লেখা আছে মেডেলের গায়ে পড় তো।

ক্লাস-ফোরের ছেলে—অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পড়লে—ক্রিমিয়া, সিভাস্টোপোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা।

—ও-পিঠে ?

—সার্জেণ্ট এস, বি, পার্কিন্‌স্, সিক্সথ্ ড্র্যাগুন্ গার্ডস্—আঠারো শো চুয়ান্ন সাল—

দস্তুরমত অবাক্ হয়ে গেলাম। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময় সিভাস্টোপোলের রণক্ষেত্রে কোনো সাহসের কাজ করবার জন্যে এই মেডেল দেওয়া হয়েছিল ইংলণ্ডের সামরিক দপ্তর থেকে ড্র্যাগুন্ গার্ডস্ সৈন্যদলের সার্জেণ্ট পার্কিন্‌স্‌কে। এতো সাধারণ জিনিস মোটেই নয় !

ক্রিমিয়া !···সিভাস্টোপোল !···চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড্ ! কিন্তু

কলকাতার নীলমণি দাসের লেনের সুধীর সাহার কাছে সে মেডেল কোথা থেকে এল ?

—এদিকে এস, এ-মেডেল কোথায় পেয়েছ ?

—ওটা আমার স্যর !

—তোমার তা বুঝলাম। পেলে কোথায় ?

—আমার দাদু দিয়েছেন স্যর !

—তোমার দাদু কোথায় পেয়েছিলেন জানো ?

—হ্যাঁ স্যর, জানি। আমার দাদুর বাবার কাছে এক সাহেব জমা রেখে গিয়েছিল।

—কি ভাবে ?

—আমাদের মদের দোকান ছিল কি না স্যর ! মদ খেয়ে টাকা কম পড়লে ওটা বাঁধা রেখে গিয়েছিল, আর নিয়ে যায়নি—দাদুর মুখে শুনেছি।

হিসেব করে দেখলাম ছিয়াশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে সেই বছরটি থেকে, যে বছরে সার্জেন্ট পার্কিন্‌স্ (সে যেই হোক) এ-মেডেল পায়। তখন তার বয়েস যদি কুড়ি বছরও থেকে থাকে, এখন তার বয়েস হওয়া উচিত একশো ছয়। সুতরাং সে মরে ভূত হয়ে গেছে কোন্ কালে !

সেদিন ছিল শনিবার, সকালে স্কুল ছুটি হবে এবং অনেকদিন পরে সেদিন দেশে যাবো পূর্বেই ঠিক করে রেখেছিলাম। আমার এক গ্রাম-সম্পর্কে জ্যাঠামশায় ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, বেশ পড়াশুনো আছে, গ্রামেই থাকেন। ভাবলাম, তাঁকে মেডেলটা দেখালে খুসী হবেন খুব।

সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটি চেয়ে নিলাম, সোমবারে ফেরৎ দেব বললাম।

স্কুলের ছুটির পরে বাসা থেকে স্যুট্‌কেস্‌টা নিয়ে শেয়ালদ' স্টেশনে এসে আড়াইটের গাড়ি ধরলাম।

দেশের স্টেশনে যখন নামলাম, তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা।

দু'-মাইল রাস্তা হেঁটে বাড়ি পৌঁছুতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সন্ধ্যার আগেই হয়তো পৌঁছুতে পারা যেত—কিন্তু আমি খুব জোরে হাঁটিনি। ভাদ্রমাসের শেষ—অথচ বৃষ্টি তত বেশি না হওয়ায় পথঘাট বেশ শুক্‌নো, খট্‌খটে। পথের ধারের বর্ষাশ্যামল গাছপালা চোখে বড় ভাল লাগছিল অনেকদিন কলকাতা-বাসের পরে—তাই জোরে পা না চালিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলাম।

এখানে প্রথমেই বলি, আমার গ্রামের বাড়িতে কেউ থাকে না। পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা, আমি গেলে রান্না করে দিয়ে আসতেন বরাবর।

আমার এক বাল্যবন্ধু বৃন্দাবন অনেক বছর ধরে বিদেশে থাকে; পিসিমার মুখে শুনলাম, আজ দিন পনেরো হ'ল বৃন্দাবন বাড়ি এসেচে। শুনে বড় আনন্দ হোল, সন্ধ্যার পরেই ওর সঙ্গে দেখা করবো ঠিক করে, চা খেয়ে নদীর ধারে বেড়াতে বার হোলাম—যাবার সময় স্যুট্‌কেস্‌টা খুলে মেডেলটা পকেটে নিলাম। বৃন্দাবনকেও দেখাবো এবং ফিরবার পথে আমার সেই জ্যাঠামশায়কেও জিনিসটা দেখাতে হবে।

যখন নদীর ধারের পথে চলেছি, তখন সন্ধ্যার খুব বেশি দেরি নেই। শেষ ভাদ্রের বেলা, একটু সকাল সকালই সন্ধ্যা নামবে।

নদীর ধারে গিয়ে দেখি—বর্ষার দরুন নদীর জল ভয়ানক বেড়েচে, নদীর জল কূল ছাপিয়ে দু'ধারের মাঠে উঠে পড়েচে। অনেকক্ষণ বসে রইলাম, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো একটু একটু, বাদুড়ের দল বাসায় ফিরেচে।

কেউ কোনো দিকে নেই।—

এক জায়গায় বর্ষার তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে গিয়েচে। অনেকটা উঁচু পাড়, নিচে খরস্রোতা বর্ষার নদী। জায়গাটা দিয়ে যেতে যেতে একবার কি-রকম ভেঙেচে দেখবার ইচ্ছে গেল। পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচে জলের আবর্ত দেখচি, পাড়টা সেখানে অনেকখানি উঁচু, জল অনেক নিচে—হঠাৎ আমার মনে একটা অদ্ভুত ইচ্ছে জেগে উঠলো।

আমি লাফ দিয়ে পাড় থেকে জলে পড়বো।···

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ইচ্ছাটা যেন ক্রমে বেড়ে উঠচে···লাফাই ···লাফ দিই···অথচ বর্ষার খরস্রোতা নদী, কুটো ফেললে দু'খান হয়ে যায়! আমি সাঁতার জানি না,--গভীর জল পাড়ের নীচেই।

ইচ্ছাটা কিছুতেই যেন সামলাতে পারচি নে! এমন কি আমার মনে হ'ল আর কিছুক্ষণ থাকলে আমাকে লাফ দিতেই হবে, নইলে আমার জীবনের সুখ যেন চলে যাবে!···

তাড়াতাড়ি নদীর পাড় থেকে এক রকম জোর করেই চলে এলাম। কারণ, যেন মনে হচ্ছিল এর পর আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা থাকবে না, পা দুটো যেন ক্রমশঃ সীসের মত ভারি হয়ে উঠচে—এর পরে ওই বিপজ্জনক নদীর পাড় থেকে পা দুটোকে নাড়াবার ক্ষমতা চলে যাবে আমার!···

নদীর ধার থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি আসবার পথে ও-সব ইচ্ছে আর কিছু নেই। আমি নিজের মনোভাবে নিজেই আশ্চয হয়ে গেলাম—কি অদ্ভুত! ও-রকম হওয়ার মানে কি?

ট্রেনে বসে অতিমাত্রায় ধূমপান করেছিলাম মনে পড়লো। এই ভাদ্রমাসের গরমে অত ধূমপান করা ঠিক হয়নি, তার ওপর বাড়ি এসে দু'তিন পেয়ালা চা খেয়েচি। এ-সবেই ও-রকমটা হয়ে থাকবে। নিশ্চয়ই তাই।

বৃন্দাবনের বাড়ি গেলাম। বৃন্দাবনকে অনেকদিন পরে দেখে সত্যিই আনন্দ হোল। দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত বসে নানা গল্প করলাম। অনেক বছর ধরে জমানো অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনী।

বড় গরম আজ। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। ভাদ্রমাসের গুমট গরম। বৃন্দাবন বললে—চল ভাই ছাদে গিয়ে বসে গল্প করি, তবুও একটু হাওয়া পাওয়া যাবে। তুই আমাদের এখানে খেয়ে যাবি—মা বলে দিয়েছেন। তোমাদের বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েচে।

দুজনে ছাদে উঠলাম। বাড়িটা দোতলা। দোতলার ছাদের ওপর একখানা মাত্র ঘর আছে। আমি জানতাম, বৃন্দাবনের কাকা ওই ঘরটায় থাকেন।

দোতলার ছাদে উঠে দেখলাম—বাড়ির পেছন-দিকটায় বাঁশের ভারা-বাঁধা। বললুম—বাড়িতে রাজমিস্ত্রি খাটছে বুঝি, বৃন্দাবন?

—হ্যাঁ ভাই, কাকার ঘরটা মেরামত হবে; আর উত্তরদিকের দেওয়ালটার গা থেকে নোনা-ধরা ইটগুলো বার করা হচ্ছে।

বৃন্দাবন দোতলার ঘরটার মধ্যে ঢুকলো—আমার কিন্তু মনে কেমন একটা অস্থির ভাব!

খানিকক্ষণ ঘরের মধ্যে গল্প করে আমি একটু জল খেতে চাইলাম—বৃন্দাবন জল আনতে নিচে নেমে গেল, আমি ছাদে পায়চারি করতে লাগলুম।

ছাদে কেউ নেই। অন্ধকার ছাদটা।·· যে-দিকটায় রাজমিস্ত্রিরা ভারা-বেঁধে কাজ করচে, পায়চারি করতে করতে সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখচি, হঠাৎ আমার মনে হোল,—ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়িনে কেন?

—বেশ হবে। লাফ দেবো?

প্রায় দুর্দমনীয় ইচ্ছা হ'ল লাফ দেবার।

—লাফ দেওয়াই ভালো। লাফ দিতেই হবে। দিই লাফ?

এমন সময় বৃন্দাবন ছাদের ওপর এসে বললে—এসো ঘরের মধ্যে, মা চা পাঠিয়ে দিচ্চেন; ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

আরও প্রায় আধঘণ্টা কথা বলবার পরে, নিচে থেকে চা ও খাবার এসে পৌঁছুলো। আমরা দুই বন্ধুতে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করলুম। তারপর বৃন্দাবন খাওয়ার কতদূর যোগাড় হোল, দেখতে নীচে চলে গেল।

ঘরের মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরের ছাদে খোলা হাওয়ায় আবার বেড়াতে লাগলাম। রাজমিস্ত্রিদের ভারার কাছে এসে দাঁড়িয়েই আবার মনে হ'ল—লাফ এবার দিতেই হবে।

কেউ নেই ছাদে। কেউ বাধা দিতে আসবে না— এই উপযুক্ত অবসর! সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের গভীর তলায় কে যেন বলচে—লাফ দিও না, মূর্খ! লাফ দিও না, পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবে।

আমার মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করচে!

কতক্ষণ পরে জানিনে, এবং কিসে থেকে কি হ'ল তাও জানিনে,—হঠাৎ বৃন্দাবনের চীৎকারে আমার চমক ভাঙলো!

দেখি বৃন্দাবন আমাকে হাত ধরে টেনে তুলচে!

—একি সর্বনাশ! তুমি লাফ দিয়ে পড়লে দেখলাম যেন! ভাগ্যিস্, বাঁশে পা বেধে গিয়েচে তাই রক্ষে!—কি হোল তোমার?

আমার মাথা যেন কেমন ঘুরছিল! গা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। বৃন্দাবনকে বললাম—আমি ভাই কিছুই জানিনে তো।···

বৃন্দাবন ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আমায় শুইয়ে দিলে।

সকলে বললে—ট্রেনে আসার দরুন আর গরমে, শরীর কি-রকম খারাপ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম!

আমি জানি মাথা ঘুরে পড়ে আমি যাইনি, লাফ আমি ইচ্ছে করেই দিয়েছিলাম—তবে ঠিক যে সময়টাতে লাফ দিয়েছি—সে সময়ের কথাটা আমি অনেক চেষ্টা করে কিছুতেই মনে করতে পারলাম না।

ওদের বিছানায় শুয়ে বেশ সুস্থ বোধ করলাম। পাশ ফিরতে হঠাৎ যেন কি-একটা শক্ত জিনিস বুকের কাছে ঠেকলো। পকেটে হাত দিয়ে দেখি সুধীরের সেই মেডেলটা।

আশ্চর্য, এটার কথা এতক্ষণ একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম! বৃন্দাবনকে সেটা দেখালাম। ওদের বাড়ির সকলে মেডেলটা হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলে।

রাত্রে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আমার বাড়িতে কেউ নেই বর্তমানে, একাই থাকি এক ঘরে।

একটা জিনিস লক্ষ্য করচি; যখন থেকে বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে বার হয়ে পথে পা দিয়েচি, তখন থেকেই কেমন এক ধরনের ভয় করচে আমার! বাড়িতে যখন ঢুকলাম, তখন ভয়টা যেন বাড়লো! একা ঘরে কতবার এর আগে শুয়েচি—এমন ভয় হয়নি মনে কোনোদিন।

—না, শরীরটা সত্যিই খারাপ। শরীর খারাপ থাকলে, মনও দুর্বল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার শিয়রের কাছে একটা বড় জানালা—জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনের বন-বাগান চোখে পড়ে। বেশ জোৎস্না উঠেচে—কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর জোৎস্না। হাওয়া আসবে বলে জানালা খুলে রেখেচি।

কতক্ষণ ঘুম হয়েছিল জানিনে, ঘণ্টাখানেকের বেশি হবে না—হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হ'তে লাগলো আমার শিয়রের দিকের জানালায়

কে দাঁড়িয়ে! যেন মাথা তুলে—সেদি.ক চেয়ে দেখলেই তাকে দেখা যাবে!

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভয় হোল। অথচ কিসের যে ভয় তাও জানিনে। এমন ভয় যে, কিছুতেই শিয়রের জানালার দিকে তাকাতে পারলাম না। চোখে না দেখলেও আমার বেশ মনে হোল, জানালার গরাদেতে দুটো হাত রেখে কে দাঁড়িয়ে আছে—জ্বলন্ত-চোখে সে আমার দিকে চেয়ে রয়েচে—আমি ওদিকে চাইলেই দেখতে পাবো।

প্রাণপণে চোখ বুজে শুয়ে রইলুম,—কিছুতেই চাইব না। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু ঘরের মধ্যে কোথাও কি ইঁদুর পচেছে? কিসের পচা গন্ধ! যেন আয়োডিন্, লিণ্ট, মলম প্রভৃতির উগ্র গন্ধের সঙ্গে পচা ক্ষতের গন্ধ মেশানো!

এতকাল বাড়িতে থাকা নেই—যার ওপর বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার ভার—সে কিছুই দেখাশোনা করে না বোঝা গেল।

কে যেন আমার মনের ভেতর বলচে—চেয়ে দেখ, তোমার মাথার শিয়রের জানালার দিকে চেয়ে দেখ না?

ঘরের চারিধারে কিসের যেন একটা প্রভাব—কোনো অমঙ্গলজনক, হিংস্র, উগ্র, অশান্ত-ধরনের ব্যাপারটা,—ঠিক বলে বোঝানো যায় না। আমি যেন ভয়ানক বিপদগ্রস্ত! সে এমন বিপদ, যা আমাকে মরণের দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে—এমন কি সে দোরের চৌকাঠ পার করে অন্ধকার মৃত্যুপুরীর হিম-শীতল নীরবতার মধ্যে ডুবিয়ে দিতেও পারে।

—আমি চাইব না···কিছুতেই চাইব না শিয়রের জানালার দিকে।

কিন্তু যে প্রভাবই হোক, আমার ঘরের মধ্যে, দেওয়ালের এ-পিঠে তার অধিকার নেই। বহুকাল ধরে পূর্বপুরুষেরা বাস্তু-শালগ্রামের অর্চনা

করেছেন এ-ঘরে···এর মধ্যে কারো কিছু খাটবে না। আমার মনই আবার এ-কথাগুলো যেন বললে! অন্ধকার রাত্রে নির্জন ঘরে মন কত কথা কয়!

জানালার ধারে কি যেন একটা শব্দ হ'ল!···অদ্ভুত-ধরনের শব্দটা।

কে যেন জানালার গরাদের ওপর ঠোকা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইচে!···একবার···দু'বার তিনবার···ভয়ে আমার বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো···কাউকে ডাকবো চীৎকার করে?···একবার চেয়ে দেখবো জানালার দিকে জিনিসটা কি? হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটা ধাড়ি বৈঁজি অনেক দিন থেকে বাইরের দেওয়ালে, কড়িকাঠের খোলে বাসা বেঁধে আছে···আজ বিকেলেও সেটাকে একবার দেখেচি। জানালার ওপরকার কাঠে সেটা পোকা-মাকড় বা জোনাকি ধরচে···এ তারই শব্দ।

কথাটা মনে হতেই মনের মধ্যে সাহস আবার ফিরে এল।···উঃ. ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল যেন!·· শরীর অসুস্থ থাকলে কত সামান্য কারণ থেকে ভয় পায় মানুষ! পাশ ফিরে এইবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু আমার এভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না।

এ ধারণা আমার মন থেকে কিছুতেই গেল না যে, আজ রাত্রে আমি একা নই—আরও কে এখানেই আছে! নিদ্রাহীন চোখে সে আমার ওপর খরদৃষ্টি দিয়ে পাহারা রেখেচে—আমায় সে নিরাপদে বিশ্রাম করতে দেবে না আজ।···

বারবার ঘুম আসে আবার তন্দ্রা ছুটে যায়, অমনি জেগে উঠি; কিন্তু চোখ চাইতে বা বিছানার উপর উঠে বসতে সাহস হয় না···আর সেই শব্দটা মাঝে মাঝে জানালার গরাদের ওপর হতে শুনি—খুব মৃদু করাঘাতের শব্দ যেন!···

যেন শব্দটা বলচে—চেয়ে দেখো···পিছন ফিরে জানালার দিকে চেয়ে দেখো···

ঘামে দেখি বিছানা ভেসে গিয়েচে···ভাদ্রের গুমট গরম কি না!

এই অবস্থায় ভোর হ'ল।

দিনের আলো ফুটলে, লোকজনের শব্দ কানে যেতে রাত্রের ভয়টা মন থেকে কোথায় গেল মিলিয়ে! নিশ্চিন্ত মনে বেলা নটা পর্যন্ত পড়ে ঘুম দিলাম। তারপর উঠে, চা খেয়ে, পাড়ায় বেড়াতে বার হওয়া গেল।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো—তখন আমি তার বিশেষ কোনো মূল্য দিই নি—কিন্তু পরে সব কথা মনে মনে আলোচনা করে দেখে সেটা ভারী আশ্চর্য বলেই মনে হয়েছিল।

ও-পাড়ার পথে আমার সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা, যাঁকে দেখাবার জন্যে আমি মেডেলটা কাল রাত্রে সঙ্গে নিয়েই বেরিয়েছিলাম—কিন্তু বৃন্দাবনদের বাড়িতে নিমন্ত্রণের জন্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি···

আমায় দেখে তিনি বল্লেন—এই যে সুরেন, ভাল আছ? কাল তুমি এসেছ দেখলাম, তখন অনেক রাত, তাই আর ডাকলাম না। বোধ হয় বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে ফিরছিলে? আমি তখন ছাদে পায়চারি করচি, যে গরম গিয়েচে বাবা কাল রাত্রে···তোমার সঙ্গে লোক রয়েচে দেখে আরও ডাকলাম না। ও লোকটি কে? খুব লম্বা বটে—যেন শিখ কি পাঞ্জাবীর মত লম্বা—তোমার বন্ধু বুঝি? বাঙালীর মধ্যে এমন চেহারা—বেশ, বেশ!

আমি অবাক হয়ে জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললাম—আমার সঙ্গে লম্বা লোক কাল রাত্রে! সে কি জ্যাঠামশায়?

জ্যাঠামশায় আমার চেয়েও অবাক হয়ে বল্লেন—তোমার সঙ্গে লোক

ছিল না বলচো ? একা যাচ্ছিলে ? আমার চোখের দৃষ্টি একেবারে কি এত খারাপ হয়ে যাবে বাবা…

আমি হেসে বললাম—তাই হবে জ্যাঠামশায়! চোখে কি-রকম ঝাপ্সা দেখে থাকবেন। বয়েস হয়েচে তো! আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। আমি একাই বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে ফিরছিলাম। আমার হাতে আলো ছিল না, তা ছাড়া আপনাদের বাড়ির সামনের আমগাছটার ছায়া…কি-রকম আলো-আঁধার দেখেচেন চোখে…অমন ভুল হয়…

জ্যাঠামশায় যেন রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন! বললেন—কি আশ্চর্য কাণ্ড! এতটা ভুল হবে চোখের ?…আমগাছের এদিকে যখন তুমি টর্চ জ্বাললে, তখন দেখলাম তুমি আর তোমার ঠিক পেছনে একজন লম্বা মত লোক…তারপর তুমি টর্চ নিবিয়ে আমগাছের ছায়ার মধ্যে ঢুকলে, তখন জোৎস্নার আলো আর আমগাছের ছায়ার অন্ধকারে আমি বেশ দেখতে পেলাম, লোকটা তোমার পেছনে পেছনে যাচ্চে… তোমার মাথার চেয়েও যেন একহাত লম্বা…তোমার একেবারে ঠিক পেছনে…তবে খুব ভালো তো দেখতে পেলাম না…অতদূর থেকে আর আলো-অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না তো! এমন কি, একবার এ পর্যন্ত মনে হ'ল তোমায় ডেকে জিজ্ঞেস করি তোমার বন্ধুটি কে ?…একেবারে এত ভুল হবে চোখের ?

জ্যাঠামশায়কে পুনরায় বুঝিয়ে বললাম, আমার সঙ্গে কাল কেউ ছিল না। আমি একাই ছিলাম, সুতরাং তাঁর দৃষ্টিশক্তির গোলমাল ছাড়া এ-ব্যাপারের অন্য কোনো সিদ্ধান্ত করা চলে না।

সারাদিন বৃন্দাবনের সঙ্গে আড্ডা দিয়া কাটানো গেল। গতকল্য রাত্রের ভয়ের ব্যাপার দিনের আলোয় এত হাস্যকর বলে আমার নিজের কাছেই মনে হল যে, বৃন্দাবনকে সে কথাটা বলিও নি।

রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবো। বৃন্দাবনদের বাড়ি থেকে চা খেয়ে বাড়ি এসে সুটকেস্‌টা নিয়ে স্টেশনের দিকে যখন রওনা হয়েছি, তখনই সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ নেমেচে।

বাউরি-পাড়ার বড় বাগানটার মধ্যে দিয়ে যখন আসচি, তখন আমার মনে হ'ল—আমার পেছনে পেছনে কি যেন আসচে! বাগানটা পার হতে প্রায় পাঁচ ছ' মিনিট লাগে—মস্ত বড় বাগান।

বাগানের ঠিক মাঝা-মাঝি এসে হঠাৎ একবার পেছন ফিরে চাইলাম কি ভেবে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! আচম্‌কা ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঠ হয়ে গেল!

কে ওটা ওখানে দাঁড়িয়ে?

রাস্তা থেকে একটু পাশে আগাছার জঙ্গলের মধ্যে আধ-অন্ধকার এক অদ্ভুত মূর্তি! খুব লম্বা, তার মাথায় ঘোড়ার বালামচির সেই এক লম্বা ধরনের টুপি, পাতলা লোহার চেন দিয়ে থুতনির সঙ্গে বাঁধা—ছবিতে গোরা সৈনিকদের মাথায় যে ধরনের টুপি দেখা যায়! মূর্তিটা যেন নিশ্চল নিস্পন্দ অবস্থায় আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে!

আমার কাছ থেকে মাত্র দশ গজ কি তারও কম দূরে! মরিয়ার মত আর একটু এগিয়ে গেলাম। এই ভয়ানক কৌতূহল আমাকে চরিতার্থ করতেই হবে যেন! মূর্তি নড়ে না, চড়ে না,—যেন নিশ্চল পাথরের মূর্তি! কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখচি, সাত-আট গজ মাত্র দূরে তখন মূর্তিটা। তার বালামচির লম্বা টুপি ও ইস্পাতের চেনের স্ট্র্যাপ্‌ স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

আমার পা ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো, সারা দেহ কেমন অবশ হয়ে আসচে, মাথাটা হঠাৎ বড় হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় আর

আধ মিনিট এ ভাবে থাকলে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতাম—কারণ, সেই ভীষণ মূর্তির মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে—আমার পা দুটো বেজায় ভারী হয়েচে—নড়বার উপায় নেই মূর্তির সামনে থেকে।

কিন্তু ঠিক সেই সময় বাউরি-বাগানের পথে লণ্ঠন নিয়ে কারা ঢুকলো। দু'তিন জন লোকের গলার শব্দ শুনে আমার সাহস ফিরে এল।

আমি ওদের ডাক দিলাম চীৎকার করে। ওরা ছুটে এল।

আমায় ওখানে বনের মধ্যে দেখে তারা খুব আশ্চর্য হয়ে বলেল—ওখানে কি বাবু? কি হয়েছে?

লণ্ঠন তুলে ওরা মুখ দেখে বল্লে—ও আপনি? কি হয়েচে আপনার? মুখ একেবারে সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে—ভয়-টয় পেলেন না কি? বাউরি-বাগান জায়গাটা ভাল নয়। সন্ধ্যের পর এখানে অনেকে ভয় পায়।

ওদের লণ্ঠনটা যখন উঁচু করে তুলে ধরলে আমার মুখে, সেই আলোয় দেখলাম—সামনের মূর্তিটা তখনও সেখানে ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়ে! একজন বললে—কি দেখছিলেন এখানে দাঁড়িয়ে বাবু—এই ষাঁড়া গাছটা?

একজন বললে—গাছটার ডাল-পালা কেটে মাথায় ঝোপের মত করে রেখেচে, যেন মানুষ বলে অন্ধকারে ভুল হয় বটে—চলে আসুন বাবু!

আমিও দেখলাম ষাঁড়া গাছই বটে। গাছটা কে ছেঁটে রেখেচে! মাথার দিকের পাতাগুলো ছেঁটে দেখতে হয়েচে ঠিক হর্স-গার্ডসদের ঘোড়ার বালামচির টুপি!

লোকের চোখের কি ভুলই হয়! কাল আমি আবার জ্যাঠামশায়কে চশমা নিতে বলছিলাম! ভেবে লজ্জা হোল মনে মনে। তিনি বৃদ্ধ

লোক, তাঁর চোখের ভুল তো হোতেই পারে—আমারই যখন এই অবস্থা !

ওরা আমায় আলো ধরে স্টেশনে পৌছে দিলে। পরের দিন স্কুলে সুধীরের মেডেলটা ফেরৎ দিলাম।

সুধীর বল্লে—আপনাকে দাদু একবার ডেকেছেন, আমার সঙ্গে ছুটির পর আমাদের বাড়ি আসুন। নিয়ে যেতে বলেছেন।

সুধীরের দাদু বল্লেন—যাক্ আমার বড় ভয় হয়েছিল মাস্টারবাবু! সুধীরের কাছ থেকে মেডেলটা নিয়ে গিয়েচেন দেশে, শুনলুম কিনা? আপনার দেশের ঠিকানা জানতুম না—তা হলে একটা তার করে দিতাম। ও মেডেলটা আমার বাবাকে একজন গোরা সৈন্য দিয়ে যায়—আমি তখন জন্মাই নি। বাঁধা দিয়েছিল আর উদ্ধার করতে পারেনি। বেজায় মাতাল আর গোঁয়ার লোকটা। ও মেডেলের বিপদ হচ্ছে—আমাদের বংশের লোক ছাড়া অন্য কেউ নিলে তার বড় বিপদ ঘটে। আমার এক ভগ্নীপতি একবার কিছুতেই শুনলে না—অনেক কাল আগের কথা—বাড়ি নিয়ে গেল মেডেল দেখাতে; সেই দিনই সন্ধ্যের সময় ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল। মৃতদেহের পকেট থেকে মেডেলটা বেরুলো।

আমি কলের পুতুলের মত শুধু বললাম—ছাদ থেকে? পকেটে মেডেল পাওয়া গেল?…

—হ্যাঁ মাস্টারবাবু! আমার নিজের ভগ্নীপতি, মিথ্যে কথা তো বলবো না। আজ সাতাশ-আটাশ বছর আগের কথা। ওটা আরও দু'একজন নিয়েচে—তক্ষুণি ফেরৎ দিয়ে গিয়েচে। বলে,—রাত্রে ভয় পায়, গা ছম্ ছম্ করে। কে যেন পেছনে 'ফলো' করচে এমন মনে হয়! ও বাইরের লোকের সহ্য হয় না। প্রাণ পর্যন্ত বিপন্ন হয়।

তাই ভাবছিলুম, একটা তার করে দেবো। চললেন? বসবেন না? আচ্ছা নমস্কার!

একটা কথা বলা দরকার। মাসখানেক পরে আমি আবার দেশে যাই। বাউরি-বাগানে ঢুকে যেখানে সে-রাত্রে ভয় পেয়েছিলাম, সেদিকে চেয়ে দেখে সে ষাঁড়াগাছটা কোথাও আমার চোখে পড়লো না। যে আমগাছটার ধারে ষাঁড়াগাছটা দেখেছিলাম, সেখানে দিনমানে বেশ ভাল করে দেখেছি—কোথাও সে ষাঁড়াগাছ নেই—বা গাছ কেটে নিলে যে গুঁড়িটা থাকবে, তারও কোনো চিহ্ন নেই।

কস্মিন্‌কালে সেখানে একটা বড় ষাঁড়াগাছ ছিল বলে মনেও হয় না জায়গাটা দেখে।

ডাক্তারের সাহস

বরাহনগর জায়গাটার নাম সকলেই জানে। কলকাতার উত্তরে মাইল দুই গেলেই বরাহনগর। আজকাল শ্যামবাজার মোটর বাসে যাওয়া যায়, আগে যেতে হোতো হেঁটে কিম্বা 'শেয়ারের' গাড়িতে। শেয়ারের গাড়ি ছাড়ত কোম্পানির বাগানের মোড় থেকে, এক একজনের চার আনা ভাড়া। কলকাতায় যাতায়াত করতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় ছিল না।

বরাহনগরের বড় রাস্তার দুধারে তখন কলকারখানা, মুটে মজুর, দোকান বাজার, পাট আর ভুষিমালের আড়ৎ—এই সবের ভিড় ছিল বেশি। এদের ধারে ধারে শ্রমিকদের বস্তিগুলো দেখা যেত। দিনের বেলায় পথে সোরগোল, হৈ চৈ, গরুর গাড়ির দল, জনমজুরের হল্লা, মালগাড়ির আমদানি-রপ্তানি, এমন কি মারামারি পর্যন্ত লেগে থাকত, কিন্তু সন্ধ্যে হ'লেই তাদের আর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, পথ হয়ে যেত নির্জন মরুভূমি, রাতের বেলা সে পথে হেঁটে যাওয়াও নিরাপদ ছিল না, মাঝে মাঝে এক আধটা কুকুর কেবল ডাকতে ডাকতে চ'লে যেত। অনেক অসতর্ক পথিক নাকি অনেক দিন রাতে এই পথে গুণ্ডাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে।

ভদ্রলোক কয়েকজন যে পাড়ায় থাকতেন, সে পাড়াটা গঙ্গার কাছাকাছি। তাঁরা স্টীমারে কলকাতায় আনাগোনা করতেন। সকালের দিকে বেরোতেন, আবার ফিরে আসতেন দিনের আলো থাকতে। তার-

একটা কারণ ছিল। যে পথটা দিয়ে তাঁরা পাড়ার ভিতরে ঢুকতেন, সেই পথের দক্ষিণ দিকে একটা প্রকাণ্ড পুরান বাড়ি অনেকদিন থেকে পড়ে ছিল, এবং সেই বাড়ির ধার দিয়ে সন্ধ্যের পর হেঁটে যাওয়া তাঁরা উচিত মনে করতেন না। বাড়িটা এখানকার পূর্বকালের জমিদার বংশের। এখন সে জমিদারও নেই, তাদের আগেকার ঐশ্বর্যও নেই, কেউ মরে গেছে, কেউ গেছে ছেড়ে—কিন্তু এই অট্টালিকা এখনো তার ভগ্ন দেহ নিয়ে অতীতকালের স্থবির প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে বাড়িটা জনহীন, নানা আগাছায় পরিপূর্ণ, বাদুড় আর চামচিকের বাসা শেয়াল আর সাপের অবাধ লীলাভূমি, শুধু তাই নয়, লোকের বিশ্বাস এ বাড়িতে নাকি কোনো কোনো গভীর রাত্রে মানুষের কান্না শোনা যায়। আগেকার সেই জমিদারের দুইটি মেয়ে নাকি এ বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ এ বাড়ির অন্দর মহলে ভূত আছে।

ভূতের কথা শুনলে আর রক্ষা নেই। ভগবানের চেয়ে ভূতকে ও পাড়ার লোক বেশি মানে আর ভয় করে। সুতরাং অন্ধকার হ'লে ও-পথ দিয়ে আর কেউ হাঁটে না।

কিন্তু চাটুয্যেদের জামাই এ সব আজগুবি কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। তিনি নতুন ডাক্তারি পাশ করেছেন। কুস্তি-করা দেহ, বিশাল তাঁর বুকের ছাতি, শিলং পাহাড় থেকে সেদিন একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকার ক'রে এনেছেন। তাঁর ভয়ানক সাহস। ভূতটুত তিনি গ্রাহ্য করেন না।

বড়দিন উপলক্ষে তিনি শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসেছেন! এ পাড়ার সকলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হয়েছে, সবাই তাঁকে ডাক্তার বলে ডাকে।

ছেলে-ছোকরাদের দলে তাঁর নাম ডাক খুব। একদিন ভূতের বাড়ির আলোচনায় তিনি উৎসাহভরে বললেন, যদি একটা রাত আমি ওবাড়িতে কাটিয়ে আসতে পারি তাহলে তোমরা আমাকে কি খাওয়াবে?

ছেলেরা অবাক হয়ে বললে, একটা রাত? আপনি বলেন কি ডাক্তারবাবু? দু ঘণ্টার বেশি যদি আপনি থাকতে পারেন তবে কি বলেছি।

ডাক্তার প্রথমটা হেসেই অস্থির। তারপর বললেন, কত বাজি ধরবে বলো।

ছেলেরা বললে, বাজি? আপনি যা চাইবেন ফিরে এলে পাবেন।

আচ্ছা সেই ভালো।

কথাটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হোলো না। পাড়ার বিজ্ঞ লোকেরা এসে বাধা দিয়ে বললেন, অল্প বয়সে আমরাও জল চিবিয়ে খেয়েছি কিন্তু ভূতকে মেনেছি চিরকাল। তুমি ও বাড়িতে যেয়ো না বাবা। একটা ভালো মন্দ ঘটলে তখন—

ডাক্তার হেসে বললেন, আমাদের জাতের অবনতির একটা কারণ, আমাদের ভূতের ভয়।

আমাদের কথা তবে শুনবে না?

আজ্ঞে না।

শ্বশুরবাড়ির সকলে কান্নাকাটি ক'রে অস্থির। এমন সর্বনেশে ডাকাত জামাই তাদের না হলেই ভালো ছিল। ডাক্তার বললেন, আমাকে যদি আপনারা বাধা দেন, তাহলে ভবিষ্যতে আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

শাশুড়ী বললেন, বাঁচলে ত সম্পর্ক! সম্পর্ক যাক বাবা, তুমি প্রাণে বেঁচে থাকো।

ডাক্তার কোনো কথা শুনলেন না। তাঁর বন্দুক আছে, কুকুর আছে, দেহে অপরিসীম শক্তি—তাঁর ভয় কি? সকলের বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন।

সেদিন ছিল অমাবস্যা। ডাক্তার কোটপ্যান্ট প'রে বন্দুক হাতে নিয়ে টর্চটা পরীক্ষা ক'রে হেসে বললেন, রেডি।

রাত তখন দশটা বাজে। পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে সোরগোল ক'রে একবার সেই প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখে এল। শীতের দিন, সুতরাং বিছানা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রও দিয়ে আসা হোলো। বড় একটা ঘড়ি রইল টেবিলের ওপর, একটা জলের কুঁজো আর কাঁচের গ্লাস, একটা লাঠি। এবং বলা বাহুল্য, কারবাইডের একটা উজ্জ্বল আলো। টমি—চিরবিশ্বস্ত টমি ছিল সঙ্গে সঙ্গে। কুকুরটা প্রকাণ্ড, বাঘ শিকার করতে সাহায্য করে।

দশটার পরে এক সঙ্গে সবাই বিদায় নিলে। তারা তখন এই বাড়ির ভয়ানক অন্ধকার গহ্বর থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ আর কোনোদিকে তাকাতে সাহস করলে না পাছে কিছু বিভীষিকা তাদের চোখে প'ড়ে যায়। ডাক্তার যে একা এই জনহীন অন্ধকার প্রাসাদের মধ্যে নির্বাসিত হয়ে রইল, এবং তার ভাগ্যে যে কিছু একটা ঘটবেই, এই কথা ভাবতে ভাবতে সবাই যে যার বাড়িতে গিয়ে পৌছল।

ঘরের দরজা জানলা ডাক্তার একে একে সব বন্ধ ক'রে দিলেন। কোথাও আর এতটুকু ফাঁক নেই, বাইরে বাতাস জোরে বইলেও আর কোথাও শব্দ হবে না। চারিদিক নিশব্দ, নিস্তব্ধ। এই বিশাল অট্টালিকার বাইরে যে রাস্তাঘাট আছে, লোকালয় ও মানুষ আছে, কর্মকোলাহলময় জগৎ আছে তা কিছুই বোঝবার উপায় নেই। এখানে

শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটলেও কেউ কোনোদিন জানতেও পারবে না। অমাবস্যার অন্ধকার যেন এই প্রেতপুরীকে উদরসাৎ করেছে।

ঘড়িটায় টিক্ টিক্ শব্দ হচ্ছে। এগারোটা বাজল। নিজের নিশ্বাসটা যে ইতিমধ্যে কখন ভারী হয়ে উঠেছে ডাক্তার বুঝতে পারেননি। পাঁচজনে আগে থাকতে ভয় দেখিয়ে দিয়েছে, তাই এই দুর্বলতা। মনে হোলো ঘড়িটায যেন আরো একটু আস্তে শব্দ হলে ভালো হয। ওটা ভযানক জীবন্ত, অবাধ্য। বিছানাব ওপর ব'সে ডাক্তার একবার এদিক ওদিক তাকালেন। দেয়ালগুলো জীর্ণ, তাব গায়ে নানাবকম আঁজিবুঁজি কাটা,—অনেকটা যেন মানুষেব কঙ্কালেব মতো।

খুট খুট—

ডাক্তাব চমকে ফিরে তাকালেন। না. কেউ নয়, বাতাসেব শব্দ। না, বাতাসের নয, বোধ হয কোনো পোকামাকড়ের আওয়াজ। কিন্তু কোন দিকে ? জানলায় না দবজায় ?

খট্ খট্—

কে ধাক্কা দিল দরজায় ? টমি মুখ তুলে তাকালে। একবাব সে একটু গোঁ গোঁ ক'রে উঠল, সে যেন বাঘের সন্ধান পেয়েছে। না, কেউ নয বাতাস। পুবান দরজা, বাতাসে একটু নড়ে বৈ কি। টমি তাব প্রভুব কোলেব কাছে আবার মুখ নীচু ক'রে প'ড়ে রইল। ডাক্তার হাত বুলিযে দেখলেন তার বন্দুকটা ঠিক আছে কিনা। নিজের হাতটা যেন সহজে আর নড়তে চাইছে না। কেমন যেন মনে হতে লাগল, নিজের ওপর কর্তৃত্ব তিনি হাবিযে ফেলছেন। তবু, অনেক চেষ্টায় তিনি গায়ে ঢাকা দিযে শুয়ে পড়লেন।

চোখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পলক পড়ছে না, চোখের তারা যেন স্থির হয়ে গেছে, পাথরের মত প্রাণহীন। ঘড়িটা টিক টিক

করছে। ওটা যেন জীবন্ত মানুষের মাথা, যেন ওর চোখ কান নাক আছে, ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসছে। প্রেতের মতো হাসি। হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল দেয়ালের গায়ে। ওকি? দেয়ালের সেই আঁজিবুঁজি, সেই মানুষের কঙ্কালটা নডছে কেন? ডাক্তারের বুকের ভিতরকাব রক্ত জমাট বেঁধে এল। কঙ্কালের গায়ে মাংস লাগছে একটু একটু ক'রে। হাত, পা, বুক, মাথা, মুখ। উজ্জ্বল আলোয় সেই কঙ্কাল বিরাট দানবের চেহারা নিয়ে দেয়ালে উঠে দাঁডাল। এবাব হাত বাডিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসবে।

হাত বাডিয়ে ডাক্তার বন্দুকটা ধববার চেষ্টা করলে কিন্তু হাত উঠল না। কই, বন্দুকটা ত তার কাছে নেই? কে নিলে? গলা—ডাক্তারের গলাটা কে টিপে ধরছে? স্বর নেই, চীৎকার নেই, নিশ্বাস নেই। তিনি নডবার চেষ্টা কবলেন কিন্তু সম্ভব হোলো না, খাটেব সঙ্গে তাঁকে বেঁধে দিয়েছে।

ডাক্তার জ্ঞান হারাননি, খুব সাহসী লোক তিনি। চেয়ে দেখলেন, আশ্চর্য, জলের কুঁজোটা ঘরের মেঝের ওপর পায়চারি ক'রে বেডাচ্ছে, কাঁচের গ্লাসটা দুটো ডানা মেলে প্রজাপতির মতো উডছে। হ্যাঁ, এইবার ডাক্তার একটু ভয় পেয়েছে। ভয়ে তাঁর রোমকূপগুলো আর্তনাদ ক'রে উঠল।

খট্‌ খট্‌ খট্‌—

কিসের শব্দ? কই, টমি ত আর গোঁ গোঁ ক'রে উঠল না? ডাক্তার প্রাণপণে টমির গায়ে একটা চিম্‌টি কাটল; এত জোরে যে, টমির গায়ের মাংস খানিকটা তার আঙুলে ছিঁডে উঠে এল। কিন্তু কই, টমি ত জাগল না? তবে? তবে? বেঁচে আছে ত? টমি-বেঁচে নেই, তার নিশ্বাস পড়ছে না, তার সর্বশরীরে এক বিন্দু প্রাণ নেই,

ম'রে সে কাঠের মতো প'ড়ে রয়েছে। এপাশে বন্দুক নেই, ওপাশে টমি নেই।

ঘড়িটায় আর টিক টিক শব্দ হচ্ছে না, সেটা থেমে গেছে ; কে দিলে থামিয়ে? টেবলটা এইবার নড়ে উঠল, চারটে পায়া ছড়িয়ে নাচতে লাগল। টমি, টমি? টমি বেঁচে নেই, বাঁ হাতের কাছে তার মৃত দেহ, অসাড়, অচেতন। জলের কুঁজোটা ঘুরছে, কাঁচের গ্লাসটা উড়ছে, টেবিলটা নাচছে। আর—আর সেই দানবটা হাসছে তাঁর দিকে চেয়ে।

হঠাৎ সশব্দে দরজা জানলাগুলো খুলে গেল। ডাক্তার শিউরে উঠলেন। কা'রা ঢুকছে ঘরে? বড় বড় মাথা, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল,—পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের মতো। মানুষ নয়, দানব নয়, এরা যেন আরো বিচিত্র। গভীর রাত্রির অন্ধকারে এরা এসেছে কঙ্কালটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে।

আলো কই, আলো? কারবাইডের আলোটা যেন পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটছে। কে তাকে তাড়া করেছে, কিন্তু পালাতে পারছে না, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যারা ঘরে ঢুকেছে তারা নিশ্বাস ফেলছে, দ্রুত নিশ্বাস, ঝড়ের মতো তার শব্দ।

ডাক্তারের সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। সে কেঁদে ওঠবার চেষ্টা করলে পারলে না। গলা তার বন্ধ, হাত পা বন্দী, চোখ দুটো অচেতন। দেখতে দেখতে সেই দানবের হাতখানা তার মাথার দিকে এগিয়ে এলো। আস্তে আস্তে মাথাটা ছুঁয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, মাথার সব চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে।

আঃ আঃ—খাটখানা কে নাড়ছে! ডাক্তার আবার চীৎকার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেই হিংস্র প্রেতের দল তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে তাকে নড়তে দিলে না। খাটখানা দেখতে দেখতে তাঁকে

নিয়ে শূন্যে উঠতে লাগল। ডাক্তারের মাথাটা ঘুরছে! টমি, টমি! টমি ম'রে গেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল, টমির মুখটাও দানবের মতো বদলে গেছে, টমি নখর বিস্তার ক'রে তার দিকে মুখব্যাদান ক'রে এগিয়ে আসছে।

বিশ্বাসঘাতক! তোমার এই কাজ?

টমি-দানব হেসে উঠল। ধারালো দাঁত দিয়ে ডাক্তারের পাঁজর কামড়ে ধরল।

খাটখানা শূন্যে উঠছে। মহাশূন্যের ঘন অন্ধকার দেশে। আরো—আরো উঁচুতে দানবের দেশে তাকে নিয়ে যাবে, ভূত প্রেতের রহস্য-রাজ্যে। ঊর্ধ্বদেশে খাটখানা উড়ে যাচ্ছে, দূরে, অতি দূরে,—ওই যা, তাদের হাত থেকে খাট খ'সে গেল! ডাক্তার বেগে নীচের দিকে প'ড়ে যাচ্ছেন, হয়ত কোনো মহাসমুদ্রের জলে তিনি আছাড় খেয়ে প'ড়ে তলিয়ে যাবেন। গেল, গেল—

ডাক্তারবাবু, ও ডাক্তারবাবু?

দরজায় ধাক্কা পড়তেই ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। বুকটা ধড়ফড় করছে! চোখ চেয়ে দেখলেন, সকালের আলো জানলা দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে! সর্বশরীর তাঁর তখনো কাঁপছে।

দরজা খুলুন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার চেয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। সেই আলো, ঘড়ি, টেবিল, কুঁজো ও গ্লাস, তার বন্দুক আর টমি। গলায় আওয়াজ দিয়ে তিনি বললেন, যাই হে, দাঁড়াও।

দিনে-দুপুরে

হাজরা রোডের মোড়ে ট্র্যামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্র্যাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্‌চড়্‌ ক'রে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতক্ষণে কালীঘাটের পুল থেকে আস্তে-আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্র্যামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হ'য়ে ছোটো একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে অত লোকের মধ্যেও আমি লক্ষ্য না-ক'রে পারলুম না। কারণ চেহারাটা তার ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই, কিন্তু কাপড়-চোপড় প্রায় ভিখিরির মতো। বয়েস দশ থেকে বারোর মধ্যে, পরনের কাপড়টা এত নোংরা যে আসলে যে ওটা লাল রঙের তা চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয়। রোগা, বড্ড ফ্যাকাশে, কিন্তু মুখখানাতে কেমন একটা ম্লান লাবণ্য।

—'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে:

—'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুসিও হলুম।—'কী ক'রে বুঝলে বলো তো?'

'ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন?'

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললে যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্র্যাম এসে গেছে, একটা ট্র্যাম ফসকালে এই দারুন রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললে: 'চলুন না, যাবেন?'

ও-সব কথায় কান না দিয়ে ট্র্যামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হ'তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলুম না। ট্র্যামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটরঘটর করতে-করতে বেরিয়ে গেলো।

'যাবেন তো?'

'কোথায় তোমার বাড়ি?'

'চেৎলায়—এই কাছেই।'

'কী হয়েছে তোমার মা-র?'

'কী হয়েছে জানি না তো। বড়ো অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেকদিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?'

ম্লান মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হ'লো, ভাবলুম, যাই না দেখে আসি ব্যাপারটা। কোনো তো কাজ নেই—না হয় নাইতে-খেতে একটু দেরি হবে।

বললুম, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না—' মেয়েটি আরো কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলো।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে-জন্যে ভেবো না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম। নতুন পাশ ক'রে বেরিয়েছি, আত্মীয়-বন্ধু মহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে-মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশটাকা যে-মাসে পাই, সে-মাসেই খুব খুশি। এই তো এক বন্ধুর ছেলের নিরানব্বুই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্র্যামের পয়সা খরচ ক'রে এসে তার প্রেস্কৃপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক টাকার কথাটা মুখে আনলে।

হেঁটে রওয়ানা হলুম মেয়েটির সঙ্গে কালীঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর-কোনো ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। মা বলতেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই আমি ভালো হবো। তা ডাক্তার আমরা পাবোই বা কোথায়—টাকা তো নেই।'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস না-ক'রে পারলুম না।

'কতদিন হ'য়ে গেলো, একমাস গেলো, দু'মাস গেলো, মা তো ভালো হ'লেন না। জ্বর হয়, কত সময় চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেন না—ডাক্তারবাবু, তখন আমার ভারী কান্না পায়।'

'নাঃ, কে আর থাকবে। এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলেই কাটা পড়লো। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যে কেন অসুখ করলো মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরনে হেসে বললুম, 'সে এখন কী ক'রে বলি? চলো, দেখি তো।'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হ'য়ে আছেন—একবার চোখ মেলেও তাকান না। আমি দেখুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে

ছুটতে-ছুটতে এতদূর এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার উপর কোনো ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ওষুধের দোকান, ভিতরে পাৎলুন-পরা ডাক্তাররা ব'সে—আমার তো সাহস হয় না ভিতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখেই মনে হ'লো আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি—কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা—ছি-ছি, এটা কী বললুম' আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে খেতে আসবেন—ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া কোনোদিন ভুলবো না।'

আমি মামুলিভাবে বললুম, 'না, না, দয়া আর কী, লোকের অসুখ সারানোই তো আমাদের কাজ।' কিন্তু মনে-মনে বেশ একটু গর্ববোধ না-ক'রেও পারছিলুম না। হাজার হোক, একটা মহৎ কাজে চলেছি তা তো ঠিক।

'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?'

'কিচ্ছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালীঘাট পুল পর্যন্ত আসতে-আসতেই মনে হ'তে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, মরছে না খেয়ে—তাদের সকলের উপকার করতে গেলে নিজেরই বাঁচা দায়।

পুল থেকে নেমে বাঁ দিকের রাস্তা নিলুম।

'আর কত দূর ?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তা'হলে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি ক'রে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হ'লো আপনার !'

'বাঃ, এইটুকু রাস্তা হাঁটতে পারবা না!'

এতক্ষণে আমার শরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। রুমাল বা'র ক'রে ঘাম মুছলুম। তক্ষুণি মনে হ'লো এই দিব্যি জোয়ান শরীর নিয়ে আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, আর মেয়েটা! ঐটুকু তো মেয়ে—ছুটতে ছুটতে চলেছে আমার সঙ্গে, ওর সুবিধের জন্য আমি তো একটু আস্তেও হাঁটছি না। কত যেন ঘুরেছে ও, হয়তো কতদিন ওর ভালো ক'রে খাওয়াও হয়নি, মা অসুখে প'ড়ে, কে খেতে দেবে। ওর একটু ক্লান্তির ভাব নেই, এই গনগনে রোদ—তাও যেন ওর গায়েই লাগছে না! আমার ভিতরটা কেমন একটু সঙ্কুচিত, লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। কষ্ট হচ্ছে ব'লে নিজের উপর রাগ হ'লো যেন।

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি—সত্যি বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়াগাঁ. পুকুর, বনজঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি জীর্ণ, শ্যাওলা-ধরা খ'সে-পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললে, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হ'য়ে শুয়ে। চোখ তার আধো-বোজা, খানিক পর-পর নিশ্বাস পড়ছে জোরে-জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকলে, 'মা, মা।'

কোনো জবাব এলো না।

'মা, মা, তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে ত্যাখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।'

চোখ দুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো।

একখানা হাত, বুঝি একটু ওঠবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটু আওয়াজ করলো ভাঙা গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললে, 'ডাক্তারবাবু, ভালো ক'রে দেখুন, মাকে আজই ভালো ক'রে দিন।'

কিন্তু বেশি কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস শুরু হবে। তবু আমরা ডাক্তাররা সব সময়ই একবার শেষ চেষ্টা ক'রে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বোসো খুকি, আমি এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আসছি।'

মেয়েটি বললে, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভালো হবেন তো?'

'এক্ষুনি আসছি ওষুধ নিয়ে', ব'লে আমি বেরিয়ে গেলুম। ছুটতে-ছুটতে সেই কালীঘাটের পুল, তারপর, ট্র্যাম, ভবানীপুরে এক চেনা ডিস্‌পেন্সারি থেকে একটা ইন্‌জেকশন কিনলুম, ধার ক'রে নিলুম একটা ইন্‌জেকশন-এর ছুঁচ। হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার যখন গিয়ে পৌঁছলুম, ততক্ষণে ঘণ্টা দেড়েক তো নিশ্চয়ই কেটেছে।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় কিছু গোলমাল হয়েছিল, একটু ঘুর-পথে এসে সেই বাড়ির সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি ক'রে তখন আমি কানে পিঁ-পিঁ আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার সময় তখন নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিলো না, কে জানে গিয়ে কী দেখবো। সামনের দরজাটা হাঁ-করা খোলা তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম।' না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ দুটো সুপুরিগাছ। 'দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই

তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু মেয়েটি কোথায়? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেলো? ঘরে জিনিসপত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে-ক'টা ছিল, সে-কটাই বা দেখছি না কেন?

অবাক হ'য়ে দেখলুম, ঘরটা একেবারে খাঁ-খাঁ খালি। শিগ্‌গির যে এখানে কোনো মানুষ বসবাস করেছে এমন চিহ্নও কিছু নেই। আমি এগিয়ে গেলুম, ওদিকে আর-একটা ঘর, সেটার দেয়ালে কালিঝুলি মাখা, কোণে একটা ভাঙা উনুন, বিবর্ণ একটা ঘটি প'ড়ে আছে।

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই ম'রে গেলো, আর ও মাকে নিয়ে চ'লে গেলো কেওড়াতলায়? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী ক'রে তা হ'তে পারে? ঘরে কিছু জিনিসপত্র ছিল, একটা লণ্ঠন, দু' একটা থালা-বাটি···সেগুলো?

আস্তে-আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল···মনের ভুল? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে আমার পকেটে ইন্‌জেকশন, সবই ঠিক আছে। নাকি আমি পথ ভুল ক'রে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি?

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছি, মাথার উপর যে আগুন ঝরছে সে-খেয়ালও নেই। চারদিক ছবির মতো চুপচাপ। হঠাৎ দেখি, টাক-পড়া আধা-বয়সি একটা লোক আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললে, 'কী মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনারই বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'হ্যাঁ-মশাই, আইনতঃ আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসি, জন্মে দু'বার চোখেও দেখিনি, মশাই—সংসারে কেউ কোনোখানে নেই—আইনের প্যাঁচে ঘুরতে-ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়লো আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন—এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন ত্রিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়লো, পিসি যখন স্বর্গে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হ'লো। একটা মেয়ে ছিল—' হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম স্বরে লোকটা বললে, 'ও-সব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্যে হাঁ করলুম কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরবার আগেই লোকটা ব'লে চললো, 'ঐ তো একফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেলো, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। একখানাই সাড়ি ছিলো পরনে, সেটা দিয়ে কম্ম সারলো। কী ডেঁপো মেয়ে মশাই—থাকলে আমরা একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিলো তিনপুরুষের, একরকম চ'লে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা, মশাই—হ্যাঁঃ, ভূত না হাতী! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, ও-সব কথায় কি কান দিতে আছে! নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা—আচ্ছা, হড়েগড়ে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইলো, আপনি ইচ্ছেমত বাড়ি তৈরি ক'রে নেবেন। কী বলেন?'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কদ্দিনের কথা এটা?'

'কোন্‌টা? এই পিসির···তা দু' বছর হবে। পিসির জন্যে তো কোনো ভাবনা ছিল না, মশাই, মেয়েটার জন্যে বাড়িটার এমন বদ্‌নাম

হয়েছে যে পাঁচটাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো শুনতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরোতেও পারিনে। আমি গরিব মানুষ, আমার উপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ-রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে—আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন···বলুন না।'

স্যাঙাতের সাক্ষাৎ

'দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়িটাই পছন্দ করলাম। চেঞ্জে গিয়ে, যদি শহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদ্‌লানো কী? তোমরাই বলো!

বাড়িটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি!—বলছিল কে। আমার বিশ্বাস হয় না। শহরের সুখ সুবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের মধ্যিখানে, কে আর বাড়ি ভাড়া করতে আসবে বলো? সেইজন্যই ভুতুড়ে বাড়ি বলে' সুখ্যাতি রটেছে, তাছাড়া আর কি? অন্ততঃ, আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়িটা! আমিও একা, বাড়িটাও একাকী, সন্ধ্যার মুখেই আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধুলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে' ঢুকলাম তো বাড়ির মধ্যে। ভূতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে! ঘরদোরের কেউ কোনদিন যত্ন নেয় নি, এ বাড়ির যে কখনো ভাড়াটে জুটবে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেবিল, চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আলমারি, খাট, তোশক, বিছানা, পাপোশ—আসবাবের কোনো কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ-সব। ভুতুড়ে বাড়ি বলে' কেউ আসতে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেতনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক্, নিজেই সব ঠিকঠাক্ করে' নেব! আজ তো নয়,—সেই কাল সকালে সে-সমস্ত। এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে, নিজের বিছানাটা পেতে, আজকের রাত্রের মতো ব্যবস্থা করে' নিতে পারলেই হয়। •

আপততঃ তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো-করা ধুলো। চারিধারের পুঁজি-করা ধুলোঝুলি-জঞ্জালের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কি আর করা যাবে? এখন রাত্রের মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আলো জ্বাললাম। উসকে দিলাম ওর শিখাটা।

তারপর বিছানায় গিয়ে লম্বা হলাম। অবিশ্যি, ঘুমোবার সময় হয়নি এখনো, সবে মাত্র, সন্ধ্যে উৎরেছে বলতে গেলে, তবু একটু গড়িয়ে নিতে ক্ষতি কি?

বিছানায় গড়াতে গিয়ে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢুলে পড়েছি নিজেই জানিনে। হঠাৎ এক ঝট্‌কা আওয়াজে চট্ করে' ভেঙে যায় আমার চট্‌কা। বুক ধড়াস্ করে' ওঠে, ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

বিছানা ছেড়ে, আস্তে আস্তে ইজি চেয়ারটায় বসলাম গিয়ে!

বাতিটা দিলাম আরো উসকে।

চারিধার নির্জন আর নিস্তব্ধ।

চিন্তাটাকে অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম। যে সব দিন চলে গেছে তার মধুর স্মৃতি মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। কত পুরোনো দৃশ্য আধভোলা মুখ, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, কত গান যা আগে লোকের গলায় গলায় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না আর—যারা প্রিয়জন হতে পারত অথচ ভাব হোলো না যাদের সঙ্গে—ইত্যাদি ইত্যাদি—

আপনা থেকেই কেমন গা ছম্ ছম্ করতে থাকে।

ঘণ্টা দুয়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধ ক্রমশই

আমাকে আচ্ছন্ন করে' এল। বাতি নিবিয়ে, আস্তে আস্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম।

এর মধ্যে কখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, বাতাস সোঁ সোঁ করছে, আমি শুয়ে শুয়ে তাই শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে; সব নীরব নিস্তব্ধ কেবল আমার আর্ত হৃদয় বাদে,—তার গুর গুর আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুনছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বলটি আস্তে আস্তে, কথা নেই বার্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে শুরু করল, কেউ সেধার থেকে টানছে যেন। আমার নড়বার চড়বার—এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্যন্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক্ খালি হোলো কম্বল সরতেই থাকলেন। কি আর করি আমি? ভদ্রতা আর চলে না দেখে, টানাটানি শুরু করে' দিলাম। অনেক ধস্তাধস্তি করে' কম্বলকে ধরে' এনে আপাদ-মস্তক ঢেকে দিলাম আবার।

আমি কান পেতে প্রতীক্ষায় রইলাম। কী হয় দেখি! আবার কম্বল সরতে শুরু হোলো। এবার পা-বরাবর গিয়ে পৌঁছল। আবার তাকে পা থেকে টেনে আনলুম। এমনি করে' অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অদৃশ্য টাগ্ অব্ ওআর্ চলতে থাকল। যখন তৃতীয় বার কম্বল সরে গেল তখন টানবার শক্তি পর্যন্ত অন্তর্হিত হোলো আমার। এবার কম্বলটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অস্ফুটধ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে প্রতিধ্বনির মতো সেই স্বরে প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠল। মনে হোলো যা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশি পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মতো একটা থপ্ থপ্ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—মানুষের পায়ের শব্দ কখনই অমন হতে পারে না,

অবিশ্যি অতি-মানুষের কথা বলতে পারিনে! থপ্ থপে আওয়াজটা দরজার দিকে এগিয়ে গেল, শুনলাম,—হুড়কো এবং দরজা না খুলেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শান্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি করলাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন,—স্বপ্নই—ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা করছি যে, হয় এ বিভ্রম নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোকে যেমন করে' থাকে তেমনি হঠাৎ হাসতেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ির আর সব ঘরের দরজা জানলা জোরে খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। এ'ও কি মতিভ্রম? আমারই?

চট করে' উঠে আলোটা জাললাম। জেলে দেখি আমার ঘরের দরজা আগের মতই বন্ধ রয়েছে, অকস্মাৎ খুলবার ও বন্ধ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার। তখন আরামের নিশ্বাস ফেলে, সিগারেট ধরিয়ে আমার ডেক চেয়ারটায় এসে বসলাম।

হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে আমার পিলে পর্যন্ত চমকে উঠল। সিগারেট খসে পড়ল মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারী সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার! এ কি! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধুলোর উপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ কার আবার? আরেক পায়ের দাগ, এত বড়ো যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগ নিতান্তই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

কিছু পূর্বে যে-বন্ধুটি কম্বল টানাটানি করে' গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন?

ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপনা থেকেই নিবে গেল। অনেকক্ষণ ধরে' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে

কান খাড়া করে' পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হোলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আসছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্তই খাটো বলে' কিছুতে গলতে পারছে না তা'দিয়ে। আমি ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লুম—"বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে আমার আপত্তিতে কর্ণপাত করেছে এমন মনে হোলো না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একটু ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে ফিরে যাচ্ছিল। আমার বিছানার চার পাশে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ শুনতে পেলাম, ভারী নিশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাখার ঝটাপট্ আর কি রকম একটা গুম্‌রানো গোঁয়ানো ধ্বনি। মহা মুস্কিলেই পড়া গেল তো! কেননা আমার পষ্ট বোধ হোলো ঘরে কারা যেন এসেছে, আর আমি নিঃসঙ্গ নই।

ঈষৎ উজ্জ্বল কি যেন একটা পড়ল বালিশে। দু'ফোঁটা আবার পড়ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখতে পেলাম আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা হাত যেন বাতাসে ভাসচে, এই ভেসে উঠচে এই মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশি বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে আস্তে যেমন উঠতে গেছি, কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকাঙ্খিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। ধড়াস্ করে' আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তার খানিক বাদে বোধ হোলো একটা কাপড় চোপড়ের খস্ খস্ শব্দ ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবার সব চুপ্‌চাপ! কতকালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। কম্পিত হাতে বাতি জ্বাললাম। আলো জ্বেলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক সব পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা করচি; হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্তে আবার সেই হাতীর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা করবার অজুহাতেই চমকে থেমে গেল হঠাৎ। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকিরণ করে' নিবল কিনা জানিনা, সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে উঠলো। .

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝট্‌কা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগল। আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা যেন খাড়া হয়ে রইল। দারুন অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু কী যে করব—!

প্রথমে একটা হাত তারপরে দুটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষণ্ণ বদন, ক্রমশঃ সেই বাষ্প থেকে আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগ্নকায় প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা সটান্ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লোকটার বিষণ্ণ মুখ দেখে আমার ভয় দূর হোলো, মনে হোলো এ কোনো ক্ষতি করবে না—ক্ষতিজনক ভূত এ নয় বোধ হয়? আমার স্বাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ ভালোই। খুসিই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় হঠাৎ আত্মীয় পাওয়ার মতোই—আর কি!

আমি তাকে অভ্যর্থনা করে' বল্লাম—"কে হে তুমি? তুমি কি জানো যে আমি দু তিন ঘণ্টা যাবৎ মুমূর্ষু হয়ে রয়েছি? যাক্ তোমাকে দেখে খুসিই হওয়া গেল! আমার যদি একটা চেয়ার থাকতো, অবশ্য

তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো, থামো, ঐ জিনিসটির উপর ব'সে পোড়ো না যেন!"

কিন্তু কাকেই বা বলা! ততক্ষণে অমন দামী চেয়ারটিতে সে বসে পড়েছে, চেয়ারটিও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গেল।

"দাঁড়াও দাঁড়াও, তুমি সবই ভাঙবে দেখ্‌চি—"

বলা বাহুল্য! ইজিচেয়ারটিরও সেই দুর্দশা!

"তোমার ঘটে কি বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নেই? ঘরের সব জিনিস-পত্তর ভেঙে কি তছ্‌নছ্‌ করতে চাও তুমি? করো কি, করো কি, সর্বনাশ—"

বলা নিষ্ফল! তাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে। বিছানাটাও চেয়ারগুলোর সঙ্গী হোলো। কি ভয়ানক!

"এটা কি রকম ভদ্রতা হচ্ছে শুনি?" এবার দস্তুরমতো চটেই উঠলাম আমি, "প্রথমে তো হাতীর মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয় দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু এখন এসব কি হচ্চে কী? বায়স্কোপের পর্দাতেই এরকমের রসিকতা বরদাস্ত করা চলে, লরেল্‌-হার্ডির ছবিতেই কেবল! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বোঝবার মত বয়েস হয়েছে তোমার। নেহাৎ ছেলেমানুষটি নও তো!"

"আচ্ছা আর আমি কিছু ভাঙব না। কিন্তু কি করব বলো, একুশ বছর ধরেই আমি হাঁটছি, কেবল হাঁটছি, একদণ্ড কোথাও বসতে পাইনি য্যাদ্দিন!"

তার চোখ থেকে দরবিগলিতধারে অশ্রুপাত হতে থাকে। ভূতের চোখে জল! এ যে রাম-নামের মতই অভাবনীয় ব্যাপার! বেচারি ভূত! আমার দুঃখ হোলো দস্তুরমত।

আমি বল্লাম, আমার রাগ করা উচিত হয়নি সত্যি! তুমি যে একটি বাপমাহারা সত্যি অনাথ বালক তা কি আমি জানি? তা কি করবে, এই মাটিতেই বস,—কিছুই তোমার ভার সইবে না যে! নইলে হয়ত কোলে করেই বসতুম তোমায়। হ্যাঁ, সামনে ঐখানটাতেই! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি কথা কইতে পারবো।"

সে মাটিতেই বসে পড়ল। আমার দামী কম্বলটা সে ঘাড়ে ফেলল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগ্‌ড়ীর মত করে' বাঁধল। তখন তার আয়েশ একটা দেখবার মতো!

"ভালো কথা, এত হাঁটাহাঁটি করছ কেন তুমি?" আমি জিজ্ঞাসা করি, "পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে?"

"আর কেন? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার স্ট্যাচু খাড়া করা হয়েছে? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই—ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাথুরে চেহারা দেখতেই আমি বেরিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে রয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্চিনা!"

"ভাবনার কথাই তো বটে।" আমি বলি, "নিজের চেহারা নিজে না দেখতে পাওয়ার মতো দুঃখ কি আছে! তা এক কাজ করনা কেন? এত না হেঁটে, একটা ঘোড়া টোড়া নিলেও তো পারো। ঘোড়ায় চেপে—"

"এক বেটা ঘোড়াকে, মানে ঘোড়ার ভূতকে বহুৎ বলে' কয়ে' রাজিও করেছিলাম, কিন্তু শেষটায় সে বিগ্‌ড়ে গেল হঠাৎ!" তার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ আর বিরক্তি প্রকাশ পায়: "একেবারে বেঁকে বসল আর বলল যে সারাজন্ম ছুটোছুটি করেই মরেছি এখন মরে গিয়েও সেই ছুটোছুটি? একটু জিরোতে পাবনা?"

"তারপর—?"

"আমি তাকে অনেক করে' বোঝাই ; বলি যে আমার মতো তোরও স্ট্যাচু বসিয়েছে তারা, খবর পেয়েছি আমি। আমাকে কিনা, তারা, সেখানেও, তোর পিঠেই চাপিয়ে রেখেছে—! সেইজন্যেই তো তোর পিঠে চেপেই আমি যেতে চাই!—এই না যেই শোনা, ঘোড়াটা চটেমটে এমন চিঁহি চিঁহি ডাক ছাড়ে যে, ঘোড়ায় চাপার বায়না রেখে দিয়ে সোজা পদব্রজেই আমি বেরিয়ে পড়ি!"

আমি সহানুভূতি জানাই—"ভারী মুস্কিলের কথা! এত বেশি বয়সে এতখানি হাঁটাহাঁটি কি পোষাবে তোমার? তার চেয়ে এক কাজ করলে তো পারো। রেলে যাতায়াত করলেও তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!"

"হেঁটেই মেরে দেবো। রেল আবার কেন?"—সে আশঙ্কা প্রকাশ করে, "রেলে ভারী কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন্ হয়! সেই ভয়েই তো রেলে চাপি না।"

"তা, চাপানো যে ভালোই করো!" ওর কথায় আমি সায় দিই। "ওতে খরচাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদ্দিন তুমি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে?"

"পৃথিবীতে? তা প্রায় একশ বছর!" সে জবাব দেয়—পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও।"

"পৃথিবী ছাড়িয়েও কি রকম?" আমি অবাক হই, "অন্যান্য গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?"

"আহাহা! তা কি আমি বলেছি? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন? তারা কি আমার স্ট্যাচু খাড়া করেচে?"

"তবে পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?"

"যোগবলে। আকাশ-পথেও চলা ফেরা করতে পারি কিনা

আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে দুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চারহাত পর্যন্ত ওপরে উঠি।"

"বলো কি?"

আমার মাথায় চকিতে বিজলী খেলে যায়, সেই যে কিছু দিন আগে খুব সোরগোল্ করে—হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে, ইনিই! ইনিই তবে! এ না হয়ে আর যায় না।

"ওঃ, এখন বুঝ্ছি—" হঠাৎ আমার টনক্ নড়েঃ "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় হুবহুব্।"

"কি—কি?" কৌতুহলী হয়ে ওঠে—সে।

"কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গেছল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বুঝতে পারছি সে-সব কার কীর্তি!

"কার?"

"কার আবার? তোমার।"

"তা হবে। বিষণ্ন ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগজও দেখিনি অনেকদিন!"

"দেখাতাম তোমায়, কিন্তু রাখিনি ত! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জানত কে! জানলে রাখতাম।" আমি বলি,—"কিন্তু বলো দেখি, আমার বাড়িতেই পায়ের ধূলো দিলে কেন হঠাৎ?"

"তোমার আস্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা!" সে বলতে থাকেঃ "আর এই বাড়িটায় আলো জ্বলছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখলাম তার সঙ্গে আমার নামের ভারি মিল! ভাবলুম আমারই আত্মীয় হয়তো, কিম্বা আমারই স্যাঙাত ট্যাঙাত কেউ হবে, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে

নিই না কেন আমার ষ্ট্যাচুর ঠিকানা !` যাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বসে থেকে কি লাভ ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।”

“সে কথা মন্দ নয় !”

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আমি বলি : “কিন্তু—”

সে সকরুণ চোখ তুলে তাকায় আমার দিকে।

“তোমার নামটি কি তা তো বলে গেলে না ?”

“তোমার নাম ? আউট্ রাম।” সে বলে—“জাঁদরেল্ আউট্‌রাম ! বেঁচে থাকতে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে আমায় ডাকৃত সবাই। এ রকম অদ্ভুত নাম শুনেচ এর আগে ? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা আসি তবে ?—কেমন ?”

আমার বাক্যস্ফূর্তি হবার আগেই আউট্‌রাম আউট হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।

জঙ্গল বাড়ির বৌ-রানী

অনেক দিন থেকেই সাধ, অকূল বিশাল কোন নদীর ওপর পানসি করে কয়েকটা দিনরাত্রি খেয়াল মত স্রোতে ভাসিয়ে কাটিয়ে দেব। অনেক দিন থেকে,—মানে 'ছিন্নপত্র' পড়া অবধি। সেই যে কয়েকটা ছেঁড়া ছেঁড়া আলগা ছবি ছেলেবেলায় চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল, চাঁদের আলোয় স্বপ্নের মত বিছিয়ে থাকা বালুচর, মাঝ রাতে অন্ধকার কাঁপিয়ে বুনো হাঁসের পাখার শব্দ, সে আর মন থেকে কোন কিছুতেই মুছে যায়নি। সে সব মধুর নামগুলোও ভুলিনি! শিলাইদহ ত পৃথিবীর কোন জায়গা বলে মনে হয়না আমার এখনো। সে যেন কোন রূপকথার ভূগোলের নাম। আমার ছিন্নপত্রের 'পদ্মায়' ত রেলি-ব্রাদার্সের পাটের স্টীমার যায় না, সে পদ্মা সাত সমুদ্দুর তের নদীর একটি—রুপো গলানো তার জল ঢেউ তুলে মধুকরের সপ্তডিঙাকে বড় জোর আমার মন ছেড়ে দিতে পারে দূর সিংহলে বাণিজ্যে যেতে।

ছেলেবেলার সেই সাধ হঠাৎ এবার পূরণ হয়ে গেল। একেবারে পুরোপুরি পূরণ হয়ে গেল তা বলতে পারি না, কারণ নদীটা পদ্মা নয় ধলেশ্বরী। কিন্তু তাতে এমন কিছুই আসে যায়-না। সব নদীই আশ্চর্য নদী, এপার থেকে ওপার ঝাপশা দেখলেই হোল, ফুলে উঠলেই হোল হাওয়ায় দূরের নৌকোর পাল, আর রাতের অন্ধকারে চঞ্চল জলের স্রোতে ভেসে গেলেই হোল তারার ছায়া।

বরং আসল পদ্মায় ঠিক শিলাইদহ নামটি ধরে খোঁজ করতে গেলেই

খাবাপ হ'ত। মনের ছবির সঙ্গে চোখের ছবির কেবল লাগত কাটাকাটি মারামারি, আমার স্বপ্ন যেত ভেঙে আর স্মৃতিও জমত না মধুর করে'।

আর আমার ধলেশ্বরীর বা অভাব কিসের। সেও ছোটখাট রণরঙ্গিণী মূর্তি ধবে বর্ষার প্লাবনে ভাঙ্গন ধবায় লোকালযেব কূলে। তারো বুকে চর জাগে স্বপ্নেব মত, চখাচখির ডাকে তারো দুকূল কেঁদে ওঠে অন্ধকার রাত্রে।

মাঝারি সাইজের একটি পানসি ভাড়া কবেছিলাম। মাঝি মাল্লা চাকর বাকর নিয়ে সবশুদ্ধ আমরা ছ'জন মাত্র।

এত লোকেবও বুঝি দবকাব ছিল না। বিনা তাড়া-হুড়োয নীরে সুস্থে যেমন খুশি ভেসে যাওয়াই ছিল আমাদেব কাজ, তাও বড বড গঞ্জে কি লোকালয়ের ভীড কবা ঘাটে নয, শূন্য নির্জন তীরে তীরে, শুধু পাখীর ঝাঁক বসা চডার ধারে ধারে। তার জন্যে একা চরণ মাঝিই যথেষ্ট। অধিকাংশ সময়েই তো আর সবাইএর ছুটি, একা চরণই বসে থাকে হালে কাঠেব মূর্তির মত। শুধু যখন মেঘনার মোহনায গিযে পডবার উপক্রম হল তখন স্রোতেব উজান ঠেলে যেতে দাঁড়ে হাত দিতে হয় অন্য মাঝিদেব।

'ছিন্নপত্রের' স্বপ্নের কুয়াসা মনেব মধ্যে না থাকলে পানসিব জীবন বেশ পানসে হয়ে উঠতে পারত। গরমিল ত কম নয়। ছিন্নপত্রের পদ্মায় কচুরিপানার কুৎসিৎ জঙ্গল দেখেছি বলে মনে পডে না। তা ছাড়া রামসেবকের রান্না থেকে চরণ মাঝির চেহারা পর্যন্ত খুঁত ধরবার অনেক কিছু ছিল। কিন্তু আমি ছিলাম ওসবের প্রায় ওপবে।

প্রায় ওপরে, এই জন্যে বলছি যে, চরণ মাঝির চেহারাটা সব সময়ে ঠিক স্বাভাবিক ভাবে বরদাস্ত করতে পারতাম না। এক এক সময়ে

নিজের অজান্তেই বুঝি শিউরে উঠেছি। যখন মাঝরাত্রে আর সবাই গড়িয়ে পড়েছে পানসির খোলে, মেঘ ঢাকা চাঁদের আলোয় ধলেশ্বরী থম থম করছে, আর মিশরের মমির মত শুধু চরণ আছে বসে নিস্পন্দভাবে হালে। কামরা থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ মনে হয়েছে, আবার সেখানেই ফিরে যাই। সেখান থেকে তবু অন্য মাঝিদের নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া যায়। তাতেও যেন অনেকখানি ভরশা।

সত্যি, জ্যান্ত মানুষের এমন অদ্ভুত মরা চেহারা হতে পারে আমি আগে কখন জানতাম না। রঙ তার কালো বলে নয়, কালো ত সব মাঝিই, কিন্তু তার চামড়ায় যেন কি একটা অপার্থিব বিবর্ণতা। যেন অনেকদিন মাটির তলায় সে চাপা পড়েছিল। এই সবে উঠে এসেছে; শ্যাওলাধরা ভিজে মাটি মুছে গা থেকে।

লোকটার ধরন-ধারনও অদ্ভুত। কথা সে খুব কমই কয়, অত্যন্ত ভারী হাঁড়ির মত গলায় শুধু একটু আধটু হাঁ, না ছাড়া তাকে আর কিছু বলতে শুনেছি বলেও মনে পড়ে না। অন্য মাঝিদের সাথে তার মেলা মেশাও নেই। তবু সবাই যেন একটু সভয়ে তাকে সমীহ করে দূরে রেখে চলে, সে তার মরা চামড়া সত্ত্বেও দৈত্যের মত বিশাল চেহারার জন্যে।

সেদিনও মেঘে ঢাকা, ভাঙা চাঁদের মরা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছম ছম করছে।

সন্ধ্যে থেকেই মাঝিদের মধ্যে একটু ফিস্ ফিস্ গুন গুন শুনছিলাম। রাত একটু হতেই তার কারণটা বোঝা গেল।

একজন মাঝি সাহস করে এগিয়ে এসে, কান মাথা চুলকে, আমতা

আমতা করে জানালে যে আমি যদি তাদের একটা রাত ছুটি দিই, তাহলে তারা একটু ভালো 'যাত্রা' শুনে আসে।

'যাত্রা' কোথায় হচ্ছে হেসে জিজ্ঞাসা করে' জানলাম। খানিক আগে যে গঞ্জ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেখানেই নাকি ভাবী নামজাদা এক দল এসেছে। এমন 'যাত্রা' শোনবার ভাগ্য নাকি এ তল্লাটে সহজে মিলবে না। আমার মুখের ভাবে ভরসা পেয়ে, সে আমাকেই সঙ্গে যাবার প্রস্তাব করে ফেলে এবার।

হেসে বললাম—না মাঝির পো, আমার অত শখ নেই। তবে তোমরা শুনে আসতে পার, ইচ্ছে হয়েছে যখন। কিন্তু গঞ্জের ঘাটে ত আমি থাকতে পারব না।

মাঝি তৎক্ষণাৎ খুশি হয়ে জানালে যে, আমায় সে কষ্ট তারা দেবে না। এখান থেকে কতটুকু আর পথ, তারা পাড় দিয়ে হেঁটেই যাবে। যাত্রা ভাঙতেই ফিরে আসবে ভোর বেলা। কিন্তু আমার ভয় করবে না ত।

হেসে বললাম—তা যদি একটু করে, মন্দ কি।

মাঝি সাহস দিয়ে জানালে—এখানে ভয়ের অবশ্য কিছু নেই। জল ঝড়ের সময় নয়, নৌকো নোঙর বাঁধা থাকবে নিরাপদ জায়গায়।

হঠাৎ কেন যে জিজ্ঞাসা করলাম জানিনা—চরণ মাঝি যাচ্ছে ত তোমাদের সঙ্গে।

মাঝির মুখে, 'যাচ্ছে বই কি কর্তা' শুনে কেমন আশ্বস্ত বোধ করলাম বলেই একটু লজ্জিত হলাম।

মাঝিরা সব চলে যেতেই একেবারে পানসির কামরার ছাদে উঠে বসেছিলাম। এমন অপরূপ নির্জনতা ভোগ করার সৌভাগ্য কখন ত হয়নি। মাঝিরা সবাই চলে গেছে, হিন্দুস্থানী ঠাকুর রামসেবক পর্যন্ত

সঙ্গে গেছে হুজুকে পড়ে। দূরে কোথাও একটা দুটো নৌকোর আলো পর্যন্ত নেই, বিশাল ধলেশ্বরীর বুকে আমি একা—এ কথা ভাবতেও কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

ঠিক পুলকের রোমাঞ্চ কিন্তু সেটা রইল না। রাত্রির নির্জনতা ধ্যান করতে করতে কখন বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। উঠে দেখি, চারিদিকের দৃশ্য বেশ বদলে গিয়েছে. কিন্তু ভাঙা চাঁদ পশ্চিমের দিগন্তে ঢলে পড়ে কেমন ফ্যাকাশে হলদে হয়ে উঠেছে। সেই ফ্যাকাশে হলদে চাঁদের আলোয় কুলহীন ধলেশ্বরীর রুগ্ন মলিন চেহারাটা ভারী অস্বস্তিকর লাগল। একটা নাম-না-জানা পাখী দূর আকাশে কি রকম আর্তনাদের মত ডাক ছেড়ে উড়ে গেল। শিউরে উঠলাম একটু।

বুঝলাম এতক্ষণ এই খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমান উচিত হয়নি। অনেকক্ষণ হিম খেয়ে শরীরটা কেমন ম্যাজমেজে হয়ে উঠেছে, মনটাও সেই সঙ্গে।

ওপর থেকে নামতে যাচ্ছি, হঠাৎ থমকে গেলাম। এদিকে এতবড় একটা বিশাল পোড়ো বাড়ি ছিল নাকি! বাড়ি না বলে তাকে প্রাসাদই অবশ্য বলা উচিত। ফাটল ধরা বিশাল দেয়ালগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েও এখনো যেন আকাশ আড়াল করে আছে। বুঝলাম এতক্ষণ জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলোয় এ পোড়ো প্রাসাদ কুয়াশায় মিশে ছিল, চাঁদ এখন তার পিছনে গিয়ে পড়তেই অন্ধকারের দৈত্যের মত জেগে উঠেছে। এ পোড়ো প্রাসাদ সম্বন্ধে কাল মাঝিদের কাছে খোঁজ নিতে হবে ভেবে আবার নামতে গিয়েও থামতে হ'ল।

পেছনে কি একটা ঝনঝন করে শব্দ হ'ল যেন। সত্যি বলছি, এবার ফিরে চেয়ে গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। নিজেকে একেবারে একা বলে জানবার পর হঠাৎ পেছন ফিরে আর একটি

লোককে অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করলে, গায়ে কাঁটা দেওয়া অস্বাভাবিক বোধ হয় নয়।

এ-কি চরণ! প্রায় ধরা গলায় বললাম—তুমি কখন ফিরলে। যাত্রা দেখলে না!

সে শেকল সমেত নোঙ্গরটা তুলে পানসির ওপর রেখে, গম্ভীর স্বরে বললে,—না।

কিন্তু নোঙ্গর তুললে কেন?—অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম। তার এভাবে একলা ফিরে আসাটা আমার একদম ভালো লাগছিল না।

সে সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে,—দেখেছেন!

দেখিনি। কিন্তু এইবার দেখলুম। সেদিন রাত্রিশেষে অদ্ভুত অসাধারণ সব ঘটনা এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এসেছে আমার জীবনে, তখনো তেমন ভালো করে বোধহয় বুঝিনি।

পাড়ের ওপর জলের একেবারে কিনারায় একটি দীর্ঘ নারী-মূর্তি ব্যাকুলভাবে আমাদের হাত নেড়ে ডাকছে।

কে-ও জানো নাকি!—প্রায় চীৎকার করে উঠলাম বিস্ময়ে উত্তেজনায়।

হাল ঘুরিয়ে নৌকা সেই পাড়ের কাছে ভিড়াতে ভিড়াতে চরণ শুধু নিঃশব্দে মাথা নাড়লে।

পাড়ে ভিড়তে না ভিড়তে মহিলাটি যেন পাগলের মত ঝাঁপিয়ে এসে পানসিতে উঠলেন। আমার কাছে এসে তারপর ভীত ব্যাকুল স্বরে বলেন,—আমায় বাঁচান! আমায় বাঁচান! দোহাই আপনার!

সে অবস্থায় যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে বললাম—আমার যতদূর সাধ্য

চেষ্টা করব, কিন্তু কি ব্যাপার আমার আগে একটু জানা দরকার। আপনি আমার সঙ্গে কামরায় চলুন।

আঁচল ঢাকা দিয়ে কি যেন একটা ভারী জিনিস তিনি বয়ে এনেছিলেন। কামরার চৌকাঠের কাছে সেইটের ভারে একটু হোঁচট খেতে, ভদ্রতা করে বললাম—ওটা বড্ড ভারী বোধ হয়। আমার হাতে দিতে পারেন।

তিনি এ কথায় এমন আঁতকে উঠে পিছু হটে দাঁড়াবেন জানলে নিশ্চয়ই ওকথা বলতাম না। তাই একটু বিমূঢ় ভাবেই নিজের কামরায় ঢুকে লণ্ঠনটা আর একটু উজ্জ্বল করে দিলাম।

নিজের ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় লজ্জিত হয়েছিলেন। ঘরে ঢুকে আঁচলের আড়াল থেকে একটু অদ্ভুত আকারের বাক্স বার করে, আমার সামনে রেখে তিনি বললেন,—আমায় মাপ করবেন। আপনাকে অবিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। কিন্তু ভয়ে ভয়ে এমন হয়ে গেছি!

মহিলাটিকে কামরার আলোয় এতক্ষণে ভালো করে দেখিছি। চেহারায় তাঁর স্পষ্ট বড় ঘরের ছাপ, কিন্তু কথাবার্তা ধরন-ধারন যেমন তাঁর অদ্ভুত, তেমনি অদ্ভুত তাঁর পোষাক। যাই হোক তখন সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নয়। তাঁর কথার উত্তরে জিজ্ঞাসা করলাম—ভয়টা কিসের? কি আছে ওতে?

তিনি কথা না বলে শুধু বাক্সের ডালাটা এবার তুলে ধরলেন। লণ্ঠনের সেই সামান্য আলোতেই বাক্সের ভেতর কুণ্ডলিপাকান একরাশ সাপের চোখ যেন জ্বলে উঠল। চমকে গেলাম। সাপ নয়—হীরা মুক্তোর জড়োয়া গয়না! তেমন গয়না আমি ত কখন দেখিনি।

মহিলাটি মুঠো করে কয়েকটা গহনা বাক্স থেকে তুলে' কামরার

মেঝেয় ছড়িয়ে দিলেন। আমি নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে বসলাম। সেগুলো যেন জড় বস্তু নয়, জীবন্ত ক্রূর সরীসৃপ!

দরজায় খুট্ করে একটু শব্দ হতে মুখ তুলে দেখি চরণ, কখন সেখানে নিঃশব্দে ছায়ার মত এসে দাঁড়িয়েছে। তার কোটরে ঢোকা চোখেও যেন সাপের মত হিংস্র লোভের ঝিলিক।

পলক না ফেলতেই সে সরে গেল। ভয় পেয়ে একটু বিরক্তির স্বরে বললাম,—তুলে ফেলুন এ সব বাক্সে। এসব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে আপনি কি বলে এই রাত্রে একা বেরিয়েছেন!

আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে গয়নাগুলি বাক্সে তুলতে তুলতে তিনি বললেন,—বেরুব না? ওরা যে এ সব ছিনিয়ে নিতে চায়।

ওরা কারা?

আমার শ্বশুর বাড়ির জ্ঞাতিরা। আমার স্বামী বিদেশে। ওদের এখন এই গয়নাগুলোর ওপর অসীম লোভ। ওরা সব করতে পারে এগুলোর জন্যে—খুন করতে পারে! কিন্তু আমি দেব না, কিছুতেই দেব না। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাই আমি পালিয়ে এসেছি।

কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?

যাব বাপের বাড়ি। ওরা আমায় দিন রাত আগলে রাখে, যেতে দেয় না। দোহাই আপনার! দু' ক্রোশ মাত্র গেলে আমার বাপের বাড়ি। আমায় সেখানে পৌঁছে দিন!

আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি ব্যবস্থা করছি,—বলে আমি কামরা থেকে চরণকে আদেশ দেবার জন্যে বেরুলাম।

কিন্তু আশ্চর্য! চরণ যেন আগে থাকতেই জানে। সে হালে বসে আছে। নৌকা চলছে।

বললাম—ক্রোশ দু'য়েক বাদে নৌকো থামিয়ে খবর নিও।

নিশ্চলভাবে বসে সে যেন কি একটা অস্পষ্ট জবাব দিলে অত্যন্ত বিশ্রী একটা অস্বস্তি নিয়ে আবার কামরায় ঢুকে বললাম—আমি বাইরে যাচ্ছি, আপনি এ কামরার ভেতর থেকে দরজা দিয়ে দিন।

তিনি ব্যাকুল ভাবে বললেন,—না, না, সে আরো ভয় করবে। আপনি আমার সঙ্গে থাকুন।

উত্তরে কিছু বলবার আগেই টলে গিয়ে চমকে উঠলাম। একি! নৌকো হঠাৎ ঘুরে গেল কেন! চরণ মাঝি হাল ছেড়ে দিয়েছে নাকি! পানসি নিজের খেয়ালে ঘুরছে!

টাল সামলে উঠেই বুঝলাম, আমার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। ডুবে যাওয়া চাঁদের শেষ ক্ষীণ আলোয় দেখলাম, ঠিক যমদূতের মত চরণ এসে কামরার দরজায় দাঁড়িয়েছে। কি হিংস্র লোভ তার অমানুষিক চোখে ও মুখে! বুকের রক্ত হিম হয়ে যায় সেদিকে তাকালে!

অপরিচিতা মহিলা আতঙ্কে চীৎকার করে বাক্সটি সজোরে বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালেন! ছুটে বেরিয়ে এলেন বুঝি আমার কাছে সাহায্যের আশায়। কিন্তু বৃথা। আমি বাধা দিতে যেতেই সবল হাতের একটি মুষ্টিতে মাথা ঘুরে সজোরে পড়ে গেলাম কাঠের মেঝের ওপরে। মাথায় চোট খেয়ে তখন আমার কি রকম একটা আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থা। চোখের সামনে যা ঘটছে, তা দেখতে পেলেও, আমার যেন উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, গলার স্বর পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে গেছে।

মহিলা প্রাণপণে তাঁর মহামূল্য বাক্সটি রক্ষা করিবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু স্ত্রীলোক হয়ে সে দৈত্যের সঙ্গে তিনি পারবেন কি করে।

ধীরে ধীরে বাক্সটি কায়দা করে নিয়ে, চরণ তাঁকে নৌকোর ধারে

ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি টলছেন একেবারে জলের কিনারায়। দারুন হতাশায় শেষ শক্তি সংগ্রহ করে তিনি প্রচণ্ড একটা টান দিয়ে বাক্সশুদ্ধ জলে পড়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দুষমণ।

এতক্ষণে একসঙ্গে গলার স্বর আর দেহের সাড়া পেয়ে আমি চীৎকার করে ছুটে গেলাম পানসির ধারে। মহামূল্য বোঝায় ভারি সেই বাক্সের টানে দুজনেই তলিয়ে যাচ্ছে নদীর অতলে—কেউ তবু ছাড়বে না তার দখল।

সাঁতার জানি না, মহিলাটির সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়েও কিছু করতে পারব না। আমি আবার চীৎকার করে উঠলাম। যদি কোথাও কেউ থাকে, তাই সাহায্যের আশায়।

চাঁদ ডুবে গিয়ে ভোরের প্রথম নীলচে আলোয় তখন নদীর কুয়াশা তরল হয়ে যাচ্ছে। কটা ইলিশ মাছের ডিঙি বুঝি কাছেই ছিল। চীৎকার শুনে তারা কাছে এসে ভিড়ল। ব্যাকুলভাবে এক নিশ্বাসে তাদের যথা সম্ভব সমস্ত ঘটনা জানিয়ে যেখানে তাদের দুজনে ডুবেছে সে জায়গাটা দেখালাম।

তারা প্রথম গম্ভীর হয়ে শুনে শেষে হেসে উঠল। হেসে জানালে যে এরকম আজগুবি ব্যাপার হতেই পারে না। যত ভারী জিনিসই হোক, একেবারে গায়ে বাঁধা না থাকলে কাউকে একটানে ডুবিয়ে নিতে পারে না। তাও দু-দুটো লোককে। হাতে ধরে কাড়াকাড়ি করতে করতে ডুবলে, দু'জন না হোক, একজন ভেসে উঠতই। আর তা ছাড়া দুক্রোশ কেন, এদিক ওদিক বিশ ক্রোশের ভেতর প্রাসাদের মত কোন পোড়োবাড়ি নদীর ধারে নেই। দামী গয়নার বাক্স সমেত ও রকম মেয়েলোক আসবে কোথা থেকে!

আমি রেগে উঠে বললাম—তবে কি আমি মিথ্যে বলছি।

বৃদ্ধ গোছের এক মাঝি একটি ডিঙির এক কোণে বসে এতক্ষণ নীরবে তামাক খেতে খেতে আমার কথা শুনছিল। তারা কিছু বলবার আগেই সে এগিয়ে এসে শান্ত স্বরে বললে—না বাবু, আপনি মিথ্যে বলেন নি, আমি জানি। আপনি জঙ্গল বাড়ির বৌ-রানীকে দেখেছেন?

তার সমর্থনে একটু ভরসা পেয়ে বললাম—জঙ্গলবাড়ির বৌ-রানী! তুমি জান তাহ'লে! কোথায় জঙ্গলবাড়ি বলত!

খানিক চুপ করে থেকে নীচে জলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে হঠাৎ বল্লে—ওইখানে বাবু। আজ পঞ্চাশ বছর হ'ল জঙ্গলবাড়িকে নদী টেনে নিয়েছে। তবে বৌ-রাণী তাঁর জ্বালা ভোলেন নি। এখনো মাঝে মাঝে কারো কারো পানসিতে এসে ওঠেন।

* * *

জেলেরাই আমার পানসি তারপর তীরে পৌঁছে দেয়। মাঝিমাল্লারা যাত্রা থেকে ফিরে, ব্যাকুল হয়ে তখন আমায় খুঁজছে। তাদের কাছে জানলাম, চরণ মাঝি তাদের সঙ্গেই ছিল সারারাত যাত্রার আসরে।

বুঝলাম সব না হয় স্বপ্ন! কিন্তু আমার পানসির নোঙর কে তুললে!

পানসির ভাড়া চুকিয়ে পরের দিনই কলকাতায় ফিরেছি। কাজ নেই আমার পানসি-বিহার। আমি ছিন্নপত্রই পড়ব।

বাদশাহী গল্প

বাদশাবাবু' বললেন—"দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে ?"

—"গেলেম একটা জায়গায় !"

—"কিসে গেলে ? পাল্কিতে ?"

—"না !"

—"রেল গাড়িতে ?"

—"না !"

—"পায়ে হেঁটে ?"

—"না !"

—"ইস্টিমারে ? মটোরে ? উড়োজাহাজে ?"

—না ?"

—"তবে ?"

—"শোন বলি—

'জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ—এইতো তিনটা

জলেতে চলি সাঁতার কাটি

থলেতে চলি ধবে লাঠি

আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি

তবু ছাড়েনা বিপদ আপদ সঙ্গে লেগে আছেই

—কোথাও একটা যাবার চিন্তা !'

কোথায় যাই, কিসে যাই—এই ভাবছি সারা দিনটা!”

—“একটা কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা?” কিম্বা মশার পিঠে চড়ে?”

—“গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে; সেটা বললে-

'তোমার ঐ গজগিরি দেহ গুরুভার
সাধ্য নাই বহা ক্ষুদ্র মশার
কিম্বা যুদ্ধ ঘোড়ার
জল-পী-পী কাঠের ঘোড়া তো কোন্ ছার!'

গেলেম আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। সেখানে উটপাখীকে বললেম'—

—'আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারো?'

সে বললে—'রোজ তিন মণ করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পারো তো রাজি আছি!'

সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখীর আশা ছাড়লেম। উট বললে—'যদি আলু-কাবলি আর আলুবোখারা খাওয়াতে পারো সাড়ে বত্রিশ সের করে দুবেলা, তো এসো নয় তো যাও' বলে ডাঙার জাহাজ—সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। বন মানুষটা নিচের ঠোঁট উল্টিয়ে আমাকে ভেংচে দিলে। হাতি গজদাঁত বার করে হেলে দুলে হাসতে থাকলো—নীরব হাসি!

জানোয়ারদের খোসামোদ করতে ঘেন্না ধরলো। তখন মনের দুঃখে ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বসলেম,—ছারপোকার ভয়ে পুরোনো আসনখানা পেতে।”

—“এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চললে!”

—“ঠিক ধরেছ, বাদশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ! বার হলেম ছারপোকার পিঠে—'আসুন বসুন' লেখা আসন পেতে।”

—"তখন কি হল ?"

—"এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে

ঐই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে

—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে :

পরেই মনে হচ্ছে—গরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুর্গি

তাদের সঙ্গে চড়ছি, আবার উড়ছি একস্তরে।

বন হতে বনান্তরে—দিক হতে দিগন্তরে।

পথের পন্থি এমনি বোধ করছি যেন—

মাছরাঙা হয়ে মাছ গিলছি—হঠাৎ কাঁটা বেধেছে গলে !

অমনি "অবাক" বলে, আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ—চৌকি ছেড়ে !"

—'এরে দাদামশায়কে ছারপোকা কামড়িয়েছে !

—"আরে না ভাই না, হাসি না—শোননা বলি—

জেগে দেখি অন্ধকারে ভুনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে গেছি ! চেয়ে দেখছি—

আঁধার পরে চাঁদের কলা

কতক কালো কতক ধলা।

উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাৎ

মেঘ একখানা বিরাট

—কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কিছু যায়না বলা।

গুস্তিঘর একটা তারি তলায়

তেলকালি পড়া বেজায়

সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভুষুণ্ডি কাক

—এক পা তুলে বুড়োমানুষকে দেখাচ্ছে কলা।"

—"গুপ্তিঘর কারে বলে দাদামশায় ?"

—"কে জানে ভাই দেখে মনে হলো সেটা গুপ্তিঘর।

'কে জানে ভুংখানা কি গুপ্তিঘর
ধাঁচাখানা
খাচাপানা
কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর
বারন্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ
মৌর্য শিল্পের শৌর্য বোঝাচ্ছে
সারি সারি জানালা দরজা আঁটসাঁট বন্ধ।
অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের সারি সারি কবন্ধ
মাথার জন্যে অপেক্ষা করছে একটানা
সদর দোরে পাল রাজাদের পাল্কি আছে পড়ে একখানা।'
—কোথায় এলেম কিছু ঠিক নাই
মনে ভাবছি আগাই না পিছাই।

এমন সময় নাক কাটা দুই মূর্তি এসে হাজির। খোনা খোনা নাকি স্বরে বলে—'এই যে অবু কবু, নমস্কার। কেমন আছেন ?'

বলেই দুজনে গীত ধরলেন—

'ভালো আছেন তো ? ভালো আছেন তো ?
দেখছি কাহিল নিতান্ত,
মন প্রাণ তো—আছে শান্ত ?
চিন্তে পারছেন তো ?
উপদেব উপাধ্যায়, প্রভৃত সামন্ত
ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁ আসিস্টান্ত !'

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়, বললেম—'ভালো

আর কি? যেতে যেতে রয়ে গেছি। প্রায় হয়েছে প্রাণান্ত; কই মশাইদের স্মরণ হয়না তো!'

—'কি আশ্চর্য! কত কালের ফেনশিপ্
একদম মেমারি স্লিপ্?

আমরা কিন্তু ধরেছি ঠিক। আপনি অবনীবাবু না হয়ে যান না! শিল্প-প্রাণ শিল্পিপ্রেদান শিল্পাচার্য আমরা আপনার—'বলেই ভুই প্রভূতে ভুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

আমি ভাবছি যাচ্ছি কি যাচ্ছি না। তারা বলছে—'চলেন চলেন, চলেন, দেখবেন চলেন—আমাদের ভূৎখানার অদ্ভুত কলেকসন্‌টা!'

প্রভূত বললেন—

'ভুৎ খানাটি ভুনেশ্বরের পরগণার
ভূভারতের অধুনালুপ্ত কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির
বল্লেও চলে একটি বিশেষ রত্নভাণ্ডার।'

উপদেব বল্লেন—

'এখান থেকে দেখেন ধাঁচাখানা বাড়িটার
সত্যি বলেন, কেমন লাগছে আপনার?'

আমি আর কি বলি! মুখে এলো—'ভূতগত ব্যাপার' সামলে বল্লেম, 'চমৎকার!

চৌকোস যেন লখিন্দরের মাগ্গামটা লোহার
গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাড়োর তিজেল হাঁড়ি
তোরণ মকরটি যেন পোড়া মৎস্যটি নলরাজার!'
'—বলেন তো পরিকল্পনাটি কার
দেখি ভাস্কর্য সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার?'

আমি তখন ভুয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

একবার মনে হলো বলে ফেলি—'ধীমান বিট্‌পালংএর।' কিন্তু কি জানি করে কপাল ঠুকে বললেম—'শ্যাম মিস্তিরীর কাম্বোডিয়ার!'

উপদেব একটুখানি হেসে বললেন, নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে—'আমার!'

প্রভূত বল্লেন—'চলেন, ভিতরটা দেখেন একবার!'

খট্ করে একটা তালা খোলার শব্দ হলো। কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে, ভিতরে ঢুকে দেখি, ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার! ডাইনে বাঁয়ে ভূৎখানার দুই মহাপ্রভুতে লিষ্টি ধরে দেখিয়ে চললেন। আমিও দেখে চললেম।

—'শেষু নাগবংশীদের সিল্—ভারলাগ ওস্টাইরিন হতে সংগ্রহ করা!'

—'কালিদাসের ঘোঁটন কালির একটুকরো!'

আমি বললেম—'বর্ণচ্ছটায় কোক্‌কে হারায়। কোথায় পেলেন এটি?'

—'নিউ কাস্‌ল্—পাঁচ নম্বর জেটি,
কয়লার দরে পাওয়া গেছে—এ রত্নটি!'

—'দেখেন, সগরাশ্বমেধের ঘোড়ার আক্কেল দাঁত
সিলোনে পাওয়া মাটির তলায়—পাঁচহাত!'

আমি বললেম—'এটা কি? যেন গুলে পোড়া শীতল পাটি!'

—'আজ্ঞে না, নটী বেহুলার মেখুলা সাটি!'

—'ওটা কি, শাঁখ ভাঙা নাকি?'

—'লখিন্দরের মালাই চাকি!'

—'কি একটা গজালের মতন?'

—'লৌহদন্ত মুনির দাঁতন!'

—'এটা বুঝি কাগের পালক?'

—'আজ্ঞে না, আলেকজাণ্ডারের বিউকিফেলার ঘোড়ার চক্ষের পালক!'

—'কটি কাঁচ পোকার ডানা না ?'
—'আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষণসেনের পেলেট্ ভাঙা।'
—'এটা যে দেখি ভাঙা বোতল !'
—'আজ্ঞে না মশায়, সম্রাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল !'
—'ও যে পড়লো, একটা কাগজের চিরকুট !'
—'আহা, উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোন একটুক্
করকোষ্টি ভাষায় লেখা—শুঙে দেখেন,
লোধ রেণুর গন্ধ পাবেন—অত্যল্প খুব।'
—'দেখেন, অজণ্টা গুহার দোরের ছিট্‌কিন্ !'
—'যেন আজকালের একটি চেপ্টিপিন্ !'
—'পাহাড়পুরের কাঁচা ইঁট এক খান !'
—'মহেঞ্জোদাড়োর ব্যাঙের কান।'
—এটা বুঝি নারদ মুনির পিয়োনোর তার ?'
—'অদ্ভুত শিল্পদৃষ্টি আপনার !
—'লম্বা আঙ্গুল দেখেই বুঝেছি।'
—'বাইরে পড়ে ওটা কি ?'
—'মৈপাল রাজার সুখপাল পালকি !'
—'তা হলে আমি ওটাতেই উঠি, আর কি ?—নমস্কার !'
—'বড়ই চললেন তাড়াতাড়ি
দেখান হলোনা চাঁদ সদাগরের হেঁতাল বাড়ি
নেতা ধোপানীর পাট
বড়ু চণ্ডীদাসের দোয়াত
বাংলার কৃষ্টি সবই গেল বাদ
—দেখলে হতো কাজ ভারি !'

আমি বললাম—‘পরে আসবো যদি সময় করতে পারি !’

—‘যেরূপ দিন কাল পড়েছে মশায়, দেখেন বল্লালসেনের ব্রাহ্মণ-ভোজনের খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি !’

—‘তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাৎ !’

—‘তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাৎ !’

—‘প্রণিপাৎ দণ্ডবাৎ—একটা দিয়ে যান অটোগ্রাফ !’

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি, পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট্ !

জেগে দেখি হঠাৎ হয়ে গেছি—ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ।”

নিশা অভিযান

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এ-পারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু ব'স্ শ্রীকান্ত; আমি এখ্খুনি ফিরে আসব—তোর কিচ্ছু ভয় নেই! এই পাড়ার ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলা পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে মাথার উপর আবার সেই আলো আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহুদূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত তোকে একটা কথা বলতে

ফিরে এলুম। যদি কেউ মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিস্ নে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবু দিবি নে—বলবি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস নে যেন—ঠিক আমি হলেও না, খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বলব—খবরদার কিন্তু, বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া বরফ জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি এই নিশা-অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল পাহাড়ের ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে! যেমনি আড়চোখে চাই তেমনি সেও যেন মাথা নিচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতেটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শত-পাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নিচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম। কণ্ঠস্বরে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক

কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকে আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর দুইজন হিন্দুস্থানি। কিন্তু সে যাহা হোক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না! কারণ এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—এ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক, তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-একপ্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর-আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস নি, না রে ?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না—

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া আর ওখানে কেউ ব'সে থাকতে পারত না তা জানিস্? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আসব, তোকে শুধু ডেকে আনব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময় তাহার মুখের উপর সদ্য মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোকটুকু পড়িল, তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ-অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখি নি—লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পার।

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম করা কি সোজা রে? তুই যদি করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্যামী কি না।

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাত করিয়া কহিল, ওই যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওইখানে আমি একবার নেমে যাব। যাব আর আসব, কেমন।

অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ না বলিবার পথ ত এক-প্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান্ হইতে ওই স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতে-ছিল যে, এই মন্ত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না, এবং তখন হইতে গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সত্যি বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীদের শুভাগমন না হইতে পারে: কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মট্‌কাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান ও মাংস চর্বণের ইতিহাস ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্ তর্ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণ-দিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুইটি অসমসাহসী মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বাম-দিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয় তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি, তাঁহার কাছে বোধ করি এক রামনামের জোরেই ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতি-বশতঃ এ যায়গাটা একটি ছোট-খাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের

মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে ওঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ওই যে বটগাছ: ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সে দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে ইন্দ্র।

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্চে কি না। সবাই ত পোড়াতে পারে না—একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায় শিয়াল কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোনখানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ওই হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কি না। যেখানে হোক্ ফেলে রেখে ওই বটতলার ঘাটে চান ক'রে বাড়ি চ'লে—আর দূর। ভয় কি রে! ও শিয়ালে শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা, আয়, আয়, আমার কাছে এসে ব'স।

আমার গলা দিয়ে স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে। এই টাকা কটি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিনদিন আসতে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল, কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেমনি স্পর্শ করিয়া, পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়া-চড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপরে যে গাছপালা নাই; স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে; দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্লেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়ে প্রায় এক সময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণ ভাবে আমার চোখে পড়ে নাই! ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না। গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট

অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়ন শব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি, জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছি, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে! খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নশ্বর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিল। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনি ভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ-বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য। কিন্তু এই ছোঁয়া-ছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সে দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া সে ঢের ঢের কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে। একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের

বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতেই কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাঁধা-বাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা। তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোক্‌রা ঠিক মত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে ?

কুণ্ঠিত হইয়া যাই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোবে ?

ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের এবং অন্য হাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়া-ছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে ?

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না ?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি ? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে ? আমগাছ জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না। আমগাছ জামগাছ—বুঝলি না ? এও তেমনি।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধনগ্ন বন-ঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশু-দেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া

চাহিল, তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক্--আজ আর না।

আমি খুসি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস্?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানি নে; তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকে এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া! আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল! মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, নৌকা ছেড়ে যায় নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে!

তারপরে সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগান। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে ব'স।

পিঠে-পার্বণে চীনে ভূত

রাধামাধব গুপ্ত তাঁহার মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। মাতুল ব্রহ্মদেশে কোন স্থানের ডাক্তার ছিলেন। অস্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। লোকের হাত পা কাটিয়া তিনি অনেক টাকা উপার্জন করিয়াছেন। সে টাকা তিনি খরচ করেন নাই, সঞ্চয় করিয়াছেন। সে জন্য তাঁহাকে এক জন ধনবান্ লোক বলিলেও বলিতে পারা যায়। বৃদ্ধ-বয়সে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি দেশে আসিয়াছেন।

মাতুল মাতুলানীকে তিনি প্রণাম করিলেন। রাধামাধবকে তাঁহারা অনেক আদর করিলেন। নানারূপ সুখাদ্যের আয়োজন করিয়া মাতুলানী তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। এইরূপে একদিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল। রাধামাধব দেখিলেন সে তাঁহার মাতুল-মাতুলানী দুই জনেরই শরীর সুস্থ নহে। দুই জনেরই শরীর শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। দুই জনেই সর্বদা অতি বিমর্ষভাবে থাকেন। মনে যেন সর্বদাই কিরূপ একটা ভয়—কিরূপ একটা দুশ্চিন্তা। রাধামাধব আরও দেখিলেন যে, তাঁহার মাতুলের মস্তকটি মুণ্ডিত, তাঁহার মাথায় চুল নাই। তিনি মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বর্মায় আপনি যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানের জল বায়ু কি ভাল ছিল না? আপনারা দুই জনেই অতিশয় শীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, যেন আপনাদের শরীরে কোন একটা রোগ আছে।"

মাতুল উত্তর করিলেন,—"না, আমাদের শরীরে কোন রোগ নাই।"

এইরূপে উত্তর দিয়া তিনি সে কথা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। রাধামাধব সে সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেন, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। সে জন্য রাধামাধব আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার মামা-মামীর শরীরে রোগ না থাকুক, মনে কোনরূপ রোগ হইয়াছে। কোনরূপ একটা ভয় অথবা দুর্ভাবনায় তাঁহাদের শরীর এরূপ শীর্ণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে।

পরদিন মামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন রাধামাধব! তুমি যে স্থানে ডাক্তারি কর, সে স্থানে দু'পয়সা হয় তো?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"প্রথম প্রথম বেশ দু'পয়সা হইত। তাহার পর কোথা হইতে সে স্থানে এক অবতার আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই অবধি আমার আর বড় কিছু হয় না।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অবতার কিরূপ?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"গেরুয়া কাপড় পরা একটা লোক। সেও চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। রোগীকে কখন ডাক্তারি, কখনও হোমিওপ্যাথি, কখন কবিরাজি, কখন হাকিমি, কখন স্বপ্নলব্ধ ভৌতিক ঔষধ প্রদান করে। নানা ভাবে পা রাখিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া সে বসিতে জানে। রোগীর নিকট বসিয়া ইঙ্গলা পিঙ্গলা নাড়ী, কুণ্ডলিনী প্রভৃতি নানা গল্প করে। সে বলে যে,—'আমি ভূত নামাইতে পারি, মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডাকিতে পারি। যে পর্যন্ত এই অবতারটি সে স্থানে আসিয়াছে, সেই অবধি আমার পসার প্রতিপত্তি একেবারে গিয়াছে।"

মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে লোকটি ভূত-প্রেত সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প করে, তাহা কি মিথ্যা?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"সমুদয় মিথ্যা। ভূত আবার কোথায়? ভূত বলিয়া জগতে কোনরূপ বস্তু নাই।"

মাতুল বলিলেন,—"বটে! যদি দেখিতে পাও?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"এ বিষয়ে আমি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। মৃত ব্যক্তির আত্মাকে আহ্বান করা সম্বন্ধে ইংরেজিতে যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমুদয় অমি পাঠ করিয়াছি। যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মাকে আহ্বান করিতে হয়, বন্ধু-বান্ধবের সহিত তাহা করিয়া আমি অনেক দেখিয়াছি। যেখানে ভূত আছে বলিয়া শুনিয়াছি, একেলা নির্ভয়ে সে স্থানে রাত্রিযাপন করিয়াছি। ভূত দেখিবার নিমিত্ত রাত্রিকালে একেলা শ্মশানে-মশানে অনেক ঘুরিয়াছি। এক দিন দুই দিন নয়, তিন বৎসর কাল এরূপ চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ভূতের চিহ্নমাত্রও আমি দেখিতে পাই নাই। ভূতের গল্প সব অলীক। ভূত বলিয়া জগতে কিছুই নাই।"

মাতুল বলিলেন,—"যদি প্রত্যক্ষ তোমাকে দেখাইতে পারি?"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—"তাহা হইলে আপনার নিকট আমি চিরঋণী হইয়া থাকিব। পরকালের প্রতি আমার বিশ্বাস নাই। যদি ভূত দেখিতে পাই, তাহা হইলে পরকাল সম্বন্ধে আমার মনের সন্দেহ দূর হয়।"

মাতুল বলিলেন,—"না, তুমি ছেলে মানুষ, তাই ওরূপ কথা বলিতেছ। কাজ নাই, শেষে একটা বিপদ ঘটিবে।"

রাধামাধব মাতুলকে জোর করিয়া ধরিলেন। তিনি বলিলেন যে,—"যদি যথার্থ-ই আপনি আমাকে ভূত দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে দেখাইতেই হইবে। আমি আপনাকে কিছুতেই ছাড়িব না। আপনার কোন ভয় নাই। আমার মন রতিমাত্রও বিচলিত হইবে না।"

মামা-ভাগিনেয়তে যখন এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল, তখন রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাতুল যখন দেখিলেন যে, রাধামাধব তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না, তখন তিনি বলিলেন,—"তবে আমার সঙ্গে এস।"

রাধামাধবকে লইয়া মাতুল বড় একটা ঘরের দ্বারে গিয়া তালা খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রাধামাধব দেখিলেন যে, দেয়ালের গায়ে দুই দিকে কাঠের আলমারি আছে। সেই আলমারিতে দুই স্তর কাঠের সেল্‌ফ আছে, আর তাহার উপর অনেকগুলি ছোট বড় শিশি রহিয়াছে। কোন শিশিতে মানুষের পা, কোনটিতে চক্ষু, কোনটিতে পাথুরি, কোনটিতে অস্থি, মনুষ্যদেহের নানারূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে।

মাতুল বলিলেন,—"এ আমার বাই। আমি নিজহাতে যত কিছু কাটিয়াছি-কুটিয়াছি, তাহা আমি স্পিরিটে রাখিয়া দিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আরও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল। আমার বাড়িতে একবার আগুন লাগিয়া তাহার অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।'

ঘরের পার্শ্বে একখানি কোচ ছিল। মাতুল বলিলেন,—"এই কোচের উপর তোমায় আমি বিছানা করিয়া দিতেছি। এই ঘরে একেলা শুইতে পারিবে? আমি একটি ল্যাম্প আনিয়া দিতেছি। ল্যাম্প জ্বলিতে থাকুক, অন্ধকারে থাকিয়া কাজ নাই।"

রাধামাধব উত্তর করিলেন,—স্বচ্ছন্দে আমি এই ঘরে একেলা শুইয়া থাকিব। অন্ধকার করিলেও আমার ভয় হইবে না।"

মাতুল বলিলেন,—"বেশ কথা! তুমি কিছু দেখিবে কি না দেখিবে, সে কথা এখন তোমাকে বলিব না। এখন বলিলে পূর্ব হইতে তোমার মনে একটা সংস্কার জন্মিয়া যাইবে।'

মাতুল নিজ হাতে কোচের উপর বিছানা করিয়া দিলেন। ঘরের পার্শ্বে ছোট একটি টেবল ছিল। সেই টেবলের উপর ল্যাম্প রাখিয়া তিনি বলিলেন,—রাধামাধব! এখন আমি চলিলাম। পাশের ঘরেই আমি শয়ন করি। রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। আবশ্যক হইলে তুমি আমাকে ডাকিবে, আমি তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইব।”

মাতুল প্রস্থান করিলে, রাধামাধব ঘরের দ্বার উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ঘরের অন্যান্য দ্বার-জানালা ভালরূপ বন্ধ আছে কি না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। অবশেষে ল্যাম্পের আলোক কমাইয়া দিলেন। ল্যাম্প মিট মিট করিয়া জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু ঘরের সকল বস্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল।

আজ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কোচের উপর রাধামাধব শয়ন করিলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা পরেই তিনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ নিদ্রা গিয়াছিলেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের ভিতর ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতেছিল। সেই দিকে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, আলমারির ধারে ধারে এক জন পুরুষমানুষ বেড়াইতেছে। নিজ হাতে রাধামাধব ঘরের দ্বার-জানালা বন্ধ করিয়াছিলেন। বাহির হইতে ঘরের ভিতর লোক আসিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

“এ মানুষ নহে—এ ভূত”—রাধামাধবের মনে নিশ্চয় এইরূপ বিশ্বাস হইল, ভয়ে প্রাণের ভিতর তাঁহার গুরু গুরু করিয়া উঠিল। সর্বশরীর লোমাঞ্চ হইল। চিৎকার করিয়া ফেলেন আর কি।—এমন সময় মনকে দৃঢ় করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—“পৃথিবীতে ভূত নাই, থাকিলেও তাহাকে আমি ভয় করি না। চিরকাল লোকের নিকট আমি এইরূপ মুখে শাপট করিয়াছি। আজ যদি ভয় বিহ্বল

হইয়া চিৎকার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে সকলের নিকট আমি হাস্যাস্পদ হইব। অতএব প্রাণ থাকে আর যায়, কিছুতেই আমি চিৎকার করিব না।"

রাধামাধব এইরূপ মনকে আশ্বাস দিয়া, ভূত কি করে, চুপ করিয়া তাহা তিনি দেখিতে লাগিলেন।

আলমারির উপর যে সমুদয় শিশি সাজান ছিল, ভূত একে একে সেই সমুদয় শিশি অতি মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। কোন শিশিটি বা হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়াও দেখিতে লাগিল। ঘরের অপর পার্শ্ব হইতে শিশি দেখিতে দেখিতে ভূত রাধা-মাধবের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছু নিকটবর্তী হইলে রাধামাধব দেখিলেন যে, ভূতটির মাথা নেড়া। আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তাহার পশ্চাৎ দিকে লম্বা বেণী ঝুলিতেছে। বিনুনি দেখিয়া রাধামাধব ভাবিলেন যে,—"এঃ! এটা দেশী ভূত নহে, চীনে ভূত।" অর্থাৎ কি না কলিকাতায় যাহারা জুতা গড়ে ও সূত্রধরের কাজ করে, সেই চীন দেশের লোকের ভূত। আরও একটু নিকটে আসিলে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দেখিয়া, রাধামাধবের মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইল যে, সে চীনে ভূত বটে। তাহার পোশাকও সেইরূপ ছিল। নিম্নদেহ নীলবর্ণের ঢিলা-ঢিলা ইজের দ্বারা ও উর্ধ্বদেশে সেই বর্ণের ঢিলা-ঢিলা ঘুন্টিওয়ালা জামার দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল।

আলমারির ধারে ধারে ঘরের দুই দিক ঘুরিয়া ভূত একে একে সমুদয় শিশিগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। যখন সমুদয় শিশি দেখা হইয়া গেল, তখন সে ঘোর দুঃখসূচক এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল, তাহার চক্ষু দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। তাহার পর কোচের নিকট আসিয়া রাধামাধবের সম্মুখে

দাঁড়াইল ও অতিশয় ক্ষুণ্নমনে আপনার হাত দুইটি তুলিয়া যেন কি দেখাইল। হাত দুইটি নহে, দেড়টি হাত। রাধামাধব দেখিলেন যে, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি আছে। জামার আস্তিন কেবল কোনুই পর্যন্ত উঠিল। অবশিষ্ট ভাগ ঝুলিয়া পড়িল; কারণ, তাহার ভিতর হাত ছিল না। ভয়ে রাধামাধব অচেতনপ্রায় হইলেন। তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মে সিক্ত হইয়া গেল। চিৎকার করিয়া ফেলেন, আর কি!— এমন সময় ভূত অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃতদেহের ন্যায় রাধামাধব কিছুক্ষণের নিমিত্ত পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে সাহসের সঞ্চার হইল। প্রথমে তিনি ঘর হইতে পলায়ন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ইচ্ছা এখন তিনি পরিত্যাগ করিলেন। আরও কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত চুপ করিয়া তিনি শুইয়া রহিলেন। কিন্তু সে রাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হইল না।

প্রভাত হইলে রাধামাধব উঠিয়া, পুনরায় ঘরের দ্বার জানালাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিলেন যে, দ্বার-জানালা যে ভাবে তিনি বন্ধ করিয়াছিলেন, সেই ভাবেই আছে। তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত বাহির হইতে যে কেহ আসিবে, সে উপায় ছিল না। ক্রমে মাতুলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মাতুল বলিলেন,—"রাত্রিতে তুমি যে কিছু দেখিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়া তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার মাতুলানীর ও আমার ইহাই রোগ; ইহার জন্যই আমাদের শরীর শীর্ণ হইয়া যাইতেছে ও দিন দিন আমাদের আয়ুক্ষয় হইতেছে। ইহার জন্যই শীঘ্র আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হইব। যাহা হউক, ইহার সবিশেষ বিবরণ আজ দিনের বেলা তোমাকে আমি প্রদান করিব।"

সেই দিন আহারের পর মামা-ভাগিনেয় এক স্থানে বসিয়া গল্পগাছা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মাতুল বলিলেন,—"বর্মার যে স্থানে আমি কাজ করিতাম, সে স্থানের হাসপাতাল আমার অধীনে ছিল। নিম্নপদস্থ ডাক্তারগণ বৃহৎ বৃহৎ অস্ত্রচিকিৎসা করিতে বড় সুবিধা পান না, কিন্তু এই হাসপাতালে আমার সে সুবিধা ছিল। অঙ্গচ্ছেদনাদি অনেক বড় বড় অস্ত্রচিকিৎসা আমি করিয়াছি। কোন লোকের অঙ্গ-ছেদন করিয়া, সেই কর্তিত অঙ্গটি স্পিরিটপূর্ণ শিশির ভিতর রাখা আমার বাই ছিল। যে ঘরে গত রাত্রিতে তুমি শয়ন করিয়াছিলে, সেই ঘরে সেইরূপ অনেকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে। বর্মা চীনের নিকট, চীনদেশের অনেক লোক এ দেশে বাস করিয়াছে। এক দিন এক জন চীনেম্যান আমার হাসপাতালে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি দেখিলাম যে, তাহার দক্ষিণ হাতটির কোনুই পর্যন্ত পচিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম যে,—'হাতটি কাটিয়া না ফেলিলে কিছুতেই তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না।' প্রথম সে কথায় সে সম্মত হইল না। তাহার পর যখন দেখিল যে, হাত না কাটিলে তাহার প্রাণ কিছুতেই বাঁচিবে না, তখন সে অগত্যা সম্মত হইল। অজ্ঞান করিয়া কোনুই পর্যন্ত আমি তাহার হাত কাটিয়া ফেলিলাম তাহার পর সেই হাত আমি যথারীতি সুরাপূর্ণ শিশিতে রাখিলাম। পুনরায় জ্ঞান হইবামাত্র চীনে রোগী আপনার কাটা হাত দেখিতে চাহিল। পাছে ভয় পায়, সে জন্য প্রথম আমি তাহাকে দেখাইতে চাহিলাম না। কিন্তু কাটা হাত দেখিবার জন্য সে এত কাতর হইল যে, তাহাকে না দেখাইয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। হাসপাতালের যে খাটের উপর সে শুইয়া ছিল, শিশিটি আপনার পার্শ্বে তাহার উপর রাখিয়া, বাম হাত দিয়া সে অনেকক্ষণ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস

ফেলিয়া শিশিটি সে চার পাইয়ের নীচে রাখিয়া দিল। সেই দিন হইতে মুহূর্তের নিমিত্ত শিশিটি সে চক্ষুর আড় করিতে দিত না। আর দিনের মধ্যে অনেকবার তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া অতি স্নেহের সহিত নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিত। কিছু দিন পরে সে আরোগ্য লাভ করিল। হাসপাতাল হইতে যাইবার পূর্বে আমি তামাশাচ্ছলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ডাক্তারকে বিদায় করিবে না।'

চীনে উত্তর করিল,—'আমি দুঃখী লোক। আমি আপনাকে কি দিতে পারি?'

আমি বলিলাম,—'তোমার হাতটি আমাকে প্রদান কর।'

তাহার মুখ বিষণ্ণ হইল। সে বলিল,—'মহাশয়! আমাকে ক্ষমা করুন। হাতটি আমি আপনাকে দিতে পারিব না। আমার যখন মৃত্যু হইবে, তখন দেহের সহিত এই হাতটিরও কবর দিতে হইবে। তা না করিলে পরলোকে আমাকে ঠুঁটো হইয়া বেড়াইতে হইবে। আমি এই হাতটিকে নুন দিয়া রাখিব। তাহা করিলে পচিয়া যাইবে না। আমার মৃত্যু হইলে আমার আত্মীয় স্বজন ইহাকেও দেহের সহিত গোর দিবেন।'

পুনরায় তামাশাচ্ছলে আমি বলিলাম,—'লবণ অপেক্ষা আরকে ইহা ভালরূপ থাকিবে। তাহার পর আমার নিকট হাতটি আরও ভাল অবস্থায় থাকিবে। কারণ, এরূপ বস্তু ভালরূপে রাখিবার নিমিত্ত আমার নিকট মশলা আছে। আর কিরূপে রাখিতে হয়, তাহাও আমি জানি। তোমার নিকট থাকিলে হাতটি পচিয়া যাইবে। পচা হাত লইয়া শেষে কি পরলোক যাইবে?'

আমার কথাগুলি লোকটির মনে লাগিল। উৎফুল্ল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,—'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মীয় স্বজনেরা

আসিয়া হাতটি প্রার্থনা করিলে যদি ইহা ফিরিয়া দিতে আপনি প্রতিজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনার নিকট রাখিয়া যাইতে পারি।'

আমার কুবুদ্ধি! আমি সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। একবার নহে, লোকটি বার বার আমাকে তিন সত্য করাইল। তাহার পর শিশিটি আমার হাতে দিয়া সে প্রস্থান করিল। অন্যান্য শিশির সঙ্গে আমি সে শিশিটিও রাখিয়া দিলাম।

আমি যে বাড়িতে বাস করিতাম, তাহা কাষ্ঠনির্মিত ছিল। কিছুদিন পরে আমার বাড়িতে আগুন লাগিল। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে, অনেকগুলি শিশিও আমার নষ্ট হইয়া গেল। তাহার মধ্যে চীনেম্যানের হাত-সম্বলিত শিশিটিও ধ্বংস হইয়া গেল। যাহা হউক, চীনের কথা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাহার হাতের কথা, অথবা আমার প্রতিজ্ঞার কথা,—একবারও আমার মনে উদয় হয় নাই।

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতঃকালে দুইজন চীনেম্যান আসিয়া আমাকে বলিল,—'মোঙ্গ নামক যে চীনের হাত আপনি কাটিয়াছিলেন, গত রাত্রিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আপনার নিকট হইতে সেই হাতটি লইয়া কবরে দিতে সে বার বার অনুরোধ করিয়াছে। সেই হাতের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি।'

আমার মাথায় যেন বাজ পড়িল! হাতটি ফিরিয়া দিতে আমি বার বার তিন সত্য করিয়াছিলাম। সেই সত্য হইতে আজ আমি ভ্রষ্ট হইলাম। কি আর করিব? দৈবক্রমে হাতটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি সেই কথা তাহাদিগকে বলিলাম। বিরস বদনে তাহারা চলিয়া গেল।

সেই দিন রাত্রিতে ঘরে শয়ন করিয়া আমি নিদ্রা যাইতেছি। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঘরে অল্প অল্প আলো জ্বলিতেছে।

সহসা কে আমার চুল ধরিয়া শয্যা হইতে আমাকে তুলিয়া বসাইল! চকিত হইয়া আমি চাহিয়া দেখিলাম! দেখিলাম যে, একজন চীনে আমার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আরও দেখিলাম যে, সে আর কেহ নহে, সে সেই মোঙ্গ,—যাহার হাত আমি কাটিয়াছিলাম। ভয়ে বিহ্বল হইয়া আমি কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ বাহির হইতে লাগিল। খাটের এক পার্শ্বে তোমার মামী শয়ন করিয়া ছিলেন। সেই শব্দে তাঁহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনিও চীনাকে দেখিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ আমার খাটের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চীনে কুপিত কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া ঘোরতর ভর্ৎসনাসূচক ভঙ্গি করিয়া, তাহার দক্ষিণ হাতের আধখানি অর্থাৎ কেবল বাহুটি আমাকে তুলিয়া দেখাইল। তাহার পর, সে ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া গেল। পরে যে ঘরে শিশি থাকে, সেই ঘরে খুট-খাট শব্দ হইতে লাগিল। পরে অবগত হইয়াছি যে, প্রত্যেক শিশি নিরীক্ষণ করিয়া সে আপনার হাতের অনুসন্ধান করে। শিশিতে আপনার হাত দেখিতে না পাইয়া, তাহার পর বাড়ির অন্যান্য ঘর সে পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করে। আজ কয় বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রিতে এইরূপ করিতেছে। প্রথমে শয্যা হইতে সে আমাকে উত্তোলন করে, তাহার পর কুপিত ও ভর্ৎসনাপূর্ণ ভাবে সে আমাকে তাহার হাতের আধখানি দেখায়, তাহার পর শিশি-গুলিকে দেখিয়া বেড়ায়, তাহার পর অন্যান্য ঘর অনুসন্ধান করে। রাত্রিকালে সহসা মাথার চুল ধরিয়া তুলিলে আমার বড় কষ্ট হয়। সেই জন্য মাথাটি আমি নেড়া করিয়াছি। এখন সে হাত ধরিয়া আমাকে উত্তোলন করে। যাহা হউক, তোমার মামী ও আমি এই রোগে আজ কয় বৎসর ভুগিতেছি! চাকর চাকরানী আমার বাড়িতে তিষ্ঠিতে

পারে না। এখন যাহারা আছে, রাত্রিতে তাহাদের কেহ আমার বাড়িতে থাকে না। এই রোগের জন্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি দেশে আসিয়াছি। কিন্তু চীনে ভূত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এই বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত আমি না করিয়াছি—এমন কাজ নাই। তন্ত্র, মন্ত্র, জড়ি, বড়ি, কবচ, মাদুলি, ঝাড়ান, কাড়ান, ভূত নামানো, চণ্ডু নামানো, যাহা কিছু আছে, সব করিয়াছি। তাহার পর দেশে আসিয়া চীনের নামে শ্রাদ্ধ করিয়াছি, গয়াতে পিণ্ড দিয়াছি, গরীব দুঃখীকে দান করিয়াছি, এক তীর্থস্থান হইতে অন্য তীর্থস্থানে পলায়ন করিয়া বাস করিয়াছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। যেখানে যাই না কেন, চীনে ভূত সেইখানেই আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়। আর একটি আশ্চর্য কথা এই যে, শিশিগুলি যদি আমি সঙ্গে না লইয়া যাই, তাহা হইলে উপদ্রবের আর পরিসীমা থাকে না। রাত্রিতে আমাকে শয্যা হইতে তুলিবার পর যখন সে শিশি দেখিতে না পায়, তখন ঘোরতর কুপিত হইয়া সে আমার ঘরের দ্রব্যাদি ভাঙ্গিতে থাকে, বাড়িতে ইট-পাটকেল বৃষ্টি করিতে থাকে। সে জন্য যেখানে যাই না কেন, শিশিগুলি আমাকে সঙ্গে রাখিতে হয়। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। এখন মৃত্যু হইলেই আমি যেন বাঁচি।”

রাধামাধব মাতুলের কথাগুলি শুনিলেন। মাতুলকে নানারূপ আশ্বাস প্রদান করা ব্যতীত তখন তিনি আর কিছু বলিলেন না। তাহার পর রাত্রিকালে শয়ন করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যদি মামাকে এ দায় হইতে উদ্ধার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাকে ভাবিতে হইবে না। কিন্তু এ রোগের ঔষধ কি?

ভূত প্রেত সম্বন্ধে রাধামাধব যে সমুদয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় পুস্তকের বিষয় সকল তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার

স্মরণ হইল যে,—একস্থানে আমি পাঠ করিয়াছি যে, মৃত্যুকালে লোকের মনে যদি কোনরূপ একটা একান্ত বাসনা থাকে, তাহা হইলে সে লোকের আত্মার মুক্তি হয় না। সেই বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অনেকদিন সে পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। শ্রাদ্ধ, গয়াতে পিণ্ড অথবা দীনদুঃখী-দিগকে দান, এরূপ লোকের নামে করিলে সেই আবদ্ধ আত্মার উপকার হয়। কিন্তু এ সমুদয় কাজ মাতুল করিয়া কোন ফল পান নাই।

রাধামাধবের পুনরায় স্মরণ হইল,—আর একখানি পুস্তকে পাঠ করিয়াছি যে, ভূতদিগের দৃষ্টিশক্তি প্রখর নহে, তাহাদের বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ নহে। তাহাদিগকে অনায়াসে প্রতারণা করিতে পারা যায়।

রাধামাধব স্থির করিলেন,—এই ভূতটাকে ঠকাইতে চেষ্টা করিব।

পরদিন রাধামাধব মাতুলকে বলিলেন,—"এ বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমি একটা উপায় ভাবিয়াছি। যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে কিছু দিন এই স্থানে থাকিয়া চেষ্টা করিয়া দেখি।"

মাতুল সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যাঁহারা কলিকাতার হাসপাতালে কাজ করেন, সেইরূপ ডাক্তারের সহিত রাধামাধব একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে তিনি একটি মড়ার হাত চাহিয়া লইলেন। হাতটি শিশিতে করিয়া মাতুলের অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া দিলেন। কি হয়, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সে রাত্রি পুনরায় সেই কোচের উপর তিনি শয়ন করিলেন। রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মাতুলের ঘরে তিনি ভূতের শব্দ পাইলেন। তাহার পর, চীনে ভূত যথারীতি সেই শিশির ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। যথারীতি একে একে সমুদয় শিশিগুলি সে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। যে শিশির ভিতর রাধামাধব সেই হাত রাখিয়াছিলেন, ভূত আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। শিশির ভিতর হাত দেখিয়া আনন্দে তাহার

মুখ প্রফুল্ল হইল। শিশিটি সে বাম হাতে তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া রাগে তাহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। রাগে সে শিশি দূরে ভূমির উপর নিক্ষেপ করিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল। ভূত অদৃশ্য হইল।

রাধামাধবের চেষ্টা বিফল হইল। ভূত প্রতারিত হইল না। কেন এরূপ হইল, রাধামাধব তাহা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে তিনি স্থির করিলেন যে, বাঙালী অথবা হিন্দুস্থানীর হস্ত দ্বারা ভূতকে ভুলাইতে পারা যাইবে না। আসল চীনেম্যানের হাত চাই। কিন্তু হাসপাতালে চীনেম্যানের হাত সহজে পাওয়া যায় না। তথাপি রাধামাধব নিরাশ হইলেন না। এইরূপ একটি হাতের জন্য বন্ধুদিগকে তিনি বলিয়া রাখিলেন। দৈবক্রমে এই সময় এক জন চীনে সূত্রধর তেতালার ভারা হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। সে একবারে মরে নাই। তাহার একটি হাত চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সেই হাতটি ছেদন করা হইল। রাধামাধব সেই হাতটি পাইলেন। পূর্বের মত হাতটি শিশিতে রাখিয়া পুনরায় তিনি কোচের উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ভূত যথারীতি উপস্থিত হইয়া শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। হস্তসম্বলিত শিশি দেখিয়া আজও প্রথম তাহার মনে আনন্দ হইল। কিন্তু আজও সে পূর্বের ন্যায় কুপিত হইয়া শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। শিশিটি ভাঙ্গিয়া গেল।

রাধামাধবের চেষ্টা এবারও বিফল হইল। পরদিন প্রাতঃকালে মাতুল ও তিনি হাতটি ভূমি হইতে তুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দেখিয়া মাতুল বলিলেন,—"ওঃ, বুঝিয়াছি! এটা বাম হাত। চীনে ভূতের দক্ষিণ হাত গিয়াছে। বামহাত দেখিয়া সে জানিতে পারিয়াছে যে, এটা জাল হাত, তাহার নিজের হাত নহে। সেই জন্য সে রাগ করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে।"

রাধামাধব বুঝিলেন যে, ইহাই প্রকৃত কারণ বটে। সেই দিন হইতে চীনেম্যানের দক্ষিণ হাতের জন্য তিনি সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক মাস গত হইয়া গেল। তথাপি এরূপ হাতের তিনি যোগাড় করিতে পারিলেন না। রোগে মৃত ব্যক্তির হাত হইলে চলিবে কি না, সেরূপ একটা সন্দেহ মাতুল ও ভাগিনেয়ের মনে উপস্থিত হইল। এমন সময় চীনের লড়াই আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে যে সমুদয় জাহাজ চীনদেশে গমন করে, সেইরূপ জাহাজের এক জন খালাসির সহিত রাধামাধব আলাপ করিয়া তাহাকে বলিলেন,—"আরকপূর্ণ একটি শিশি তোমাকে দিতেছি। অস্ত্রাঘাতে হত হইয়াছে, এরূপ চীনে পুরুষ মানুষের দক্ষিণ হাত যদি তুমি এই শিশির ভিতর করিয়া আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি একশত টাকা পুরস্কার দিব।"

খালাসি সম্মত হইল। অস্ত্রাঘাতে সে সময় অনেক চীনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সুতরাং এরূপ একটি হাতের যোগাড় করিতে খালাসিকে অধিক কষ্ট পাইতে হয় নাই। দুই মাস পরে সেই আরকপূর্ণ শিশি করিয়া এক জন চীনেম্যানের দক্ষিণ হস্ত সে রাধামাধবকে আনিয়া দিল।

শিশিটি রাধামাধব অন্যান্য শিশির সহিত রাখিয়া পূর্বের ন্যায় সেই ঘরে শয়ন করিয়া রহিলেন। পূর্বের ন্যায় যথাসময়ে ভূত আসিয়া একে একে শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পূর্বের ন্যায় আজও সে হস্তসম্বলিত শিশিটি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু আজ তাহার মুখে ক্রোধের লক্ষণ উদয় হইল না; আজ সে ক্রোধে শিশিটি আছড়াইয়া ফেলিল না। আনন্দের উপর আনন্দে আজ তাহার মুখশ্রী প্রফুল্ল হইতে প্রফুল্লতর হইতে লাগিল। অবশেষে শিশিটি হাতে লইয়া আনন্দে সে ঘরের ভিতর দুপ দাপ, ধুপ ধাপ নৃত্য করিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে সে "ফিং ফাং ফোঁ, পিং পাং পোঁ," বলিয়া গান করিতে

লাগিল। নাচিতে নাচিতে গান গাহিতে গাহিতে শিশিটি হাতে করিয়া ঘর হইতে সে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। রাধামাধব তাড়াতাড়ি মাতুলকে ডাকিয়া এই সুসমাচার প্রদান করিলেন। কিন্তু চীনে ভূত তখনও বাটী হইতে যায় নাই। মাঝের একটি ঘরে তখন সে এক প্রকার চপর চপর শব্দ করিতেছিল। মাতুল, মাতুলানী ও রাধামাধব সেই ঘরের দ্বারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতে-ছিল। দ্বারের ফাঁক দিয়া সকলে দেখিলেন যে, ঘরের মাঝখানে বসিয়া চীনে ভূত—থালা ও অনেকগুলি বাটি হইতে কি সব আহার করিতেছে। মাতুলানী তখন হাসিয়া বলিলেন,—"আজ পৌষ মাসের সংক্রান্তি। আজ আমি নানারূপ পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলাম। তাই মনে করিলাম যে—আহা! এই চীনে ভূতটি প্রতিদিন আমাদের বাটীতে আসে; তাহাকে কিছু দিব না! তাই থালা ও বাটিতে নানারূপ পিঠে ও পরমান্ন তাহার জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। তাই সে খাইতেছে।"

পিষ্টকাদি আহার করিয়া চীনে ভূত পরম পরিতোষ লাভ করিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে মাতুলের বাটীতে আর সে চীনে ভূতের উপদ্রব হয় নাই। মাতুল ও মাতুলানীর শরীর ও মন সুস্থ হইল। সেই দিন হইতে পরম সুখে তাঁহারা দিন যাপন করিতে লাগিলেন। মাতুল এখন মাথায় চুল রাখিয়াছেন রাধামাধবকে তিনি বলেন,—"তোমার বুদ্ধিবলে আমরা এই নিদারুণ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি। তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। আর তোমার ডাক্তারি করিতে হইবে না। সপরিবারে তুমি আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছি। টাকার জন্য তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না।"

রাধামাধব এখন মাতুলের গৃহে বাস করিতেছেন।

যখ

আজ যে যখের গল্পটি তোমাকে বলব, সে গল্প আমি শুনেছি পরের মুখে ; আর এ গল্পটির ভিতর আর যাই থাক, পিলে-চমকান ভয় নাই।

আমি নিজে পথিমধ্যে একবার একটি যখ দেখেছিলুম—কোথায় কখন, কি অবস্থায়, তার ইতিবৃত্ত একটি গল্প আকারে প্রকাশ করেছি। সেই যখ দেখে এতটা ভয় পাই যে যখন বাড়ি গিয়ে উঠলুম, তখন আমার দেহের উত্তাপ ১০৪° ডিগ্রীতে উঠে গিয়েছে। একে জ্যৈষ্ঠ মাস, আকাশে হচ্ছে অগ্নিবৃষ্টি তার উপর ম্যালেরিআর দেশ, তার উপর মনের উপর বিভীষিকার প্রচণ্ড ধাক্কা এই সব মিলে আমার নাড়িকে যে ঘোড় দৌড় করাবে, তাতে আশ্চর্য কি ?—বাড়ি গিয়েই বিছানা নিলুম, আর সাতদিন সেখান থেকে নড়িনি। আমার চিকিৎসার ভার নিলেন জনৈক পাড়াগেঁয়ে কবিরাজ। তাঁর ওষুধ হল দুটি—লঙ্ঘন আর পাচন। সে পাচন যেমন সবুজ তেমনি তিতো। লঙ্ঘনের চোটে ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করত ; তাই সেই পাচন ওষুধ হিসেবে নয়, রোগীর পথ্য হিসেবে গলাধঃকরণ করতুম। আমার বিছানার পাশে সমস্ত দিন হাজির থাকতেন রমা ঠাকুর। আর এই শয্যাশায়ী অবস্থায় তাঁর মুখে, এ গল্প শুনেছি।

আগে দু'কথায় রমাঠাকুরের পরিচয় দিই ; কারণ তিনি ছিলেন যেমন গরিব, তেমনি ভাল লোক। তাঁর পুরো নাম রমাকান্ত নিয়োগী ঠাকুর। এঁরই পূর্বপুরুষরা পূর্বে আমাদের গ্রামের মালিক ছিলেন। পরে নিয়োগী বংশ ধনেপ্রাণে ধ্বংস হয়। শেষটায় এঁদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন

একমাত্র রমাঠাকুর। তিনি একা বাস করতেন একখানি খড়ো ঘরে। কখনও বিবাহ করেননি, ফলে তাঁর ঘরে আর দ্বিতীয় লোক ছিলনা। তিনি অবশেষে হয়েছিলেন আমাদের কুল দেবতার পূজারী। আমাদের কুলদেবতা 'শ্যামসুন্দর' ছিলেন জঙ্গম ঠাকুর—কোন শরিকের বাড়ি পালাক্রমে থাকতেন দুদিন, কোন বাড়িতে বা তিন দিন। ঠাকুরের ভোগ খেয়ে ও দক্ষিণা নিয়েই তাঁর অন্ন বস্ত্রের সংস্থান হত; আর উপরি সময় তিনি পাঁচ জনের শুশ্রূষা করতেন। লোকটি আকারে ছোটখাট; তাঁর বর্ণ শ্যাম, আর মাথার চুল একদম সাদা। এমন নিরীহ, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক হাজারে একটি দেখা যায় না। তাঁর নিজের কোনও কাজ ছিল না, কিন্তু পরের অনেক ফাইফরমাস খেটে তিনি হাঁপ জিরবার সময় পেতেন না।

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে রমাঠাকুরকে আমার যখ দর্শনের গল্প বললুম। তিনি সে গল্প শুনে আমাকে ভরসা দিলেন যে কিছু ভয় নেই, তুমি দুদিনেই ভাল হয়ে উঠবে: যখ তোমার আমার মত লোকের হন্তারক নয়। তবে আমার গল্প তিনি সত্য বলেই মেনে নিলেন; কেননা রমাঠাকুরও একবার দিনদুপুরে নয়, রাতদুপুরে যখ দেখেছিলেন। আর তিনি যে জলজ্যান্ত যখ দেখেছিলেন, সে বিষয় তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি ইংরেজি পড়েননি, সুতরাং যা দেখতেন যা শুনতেন তাতেই বিশ্বাস করতেন। আমার কথা আলাদা। আমি ইংরেজি পড়েছি, সুতরাং যা দেখি শুনি তাতে বিশ্বাস করিনে। আমার থেকে থেকেই মনে হত যে, আমি যখ টখ কিছুই দেখিনি। পাল্কির ভিতর হয়ত ঘুমিয়ে পড়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম। ওষুধই যে শুধু স্বপ্নলব্ধ হয় তা নয়; কখনও কখনও স্বপ্নলব্ধ গল্প কবিতাও পাওয়া যায়। তা যে হয়, তা ইংরেজি সাহিত্যের

ইতিহাস পড়লেই জানতে পাবে। এখন নিয়োগী ঠাকুরের গল্প শোন। শুনতে কিছু কষ্ট হবেনা, কেন না গল্পটি এত ছোট্ট যে, একটি ছোট এলাচের খোসার ভিতর তাকে পোরা যায়। রমাঠাকুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, নন্দীগ্রাম কোথায় জানেন? আমি বললুম, না।

তিনি বললেন—তা জানবেন কি করে? আপনি দু-পাচ বছরে একবার বাড়ি আসেন, আর দু'পাচদিন থেকেই চলে যান। নন্দীগ্রাম এখান থেকে দু-পা। এই দক্ষিণের বিলটে পেরিয়ে তারপর মাঠটার ওপারে বাঁয়ে ভেঙ্গে যে পথটা পাওয়া যায়, সেই পথটায় কিছুদূর গেলেই নন্দীগ্রামে পৌছান যায়। এখান থেকে মাত্র পাচ ক্রোশ রাস্তা।

বছর তিনেক আগে আমার একবার নন্দীগ্রামে যাবার দরকার ছিল। দরকার আর কিছুই নয়—সেখানে গেলে খালি হাতে আর ফিরতে হত না। সে গ্রামের অধিকারী বাবুরা দেবদ্বিজে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, যদিচ তাঁরাও ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাদের দ্বারস্থ হলে টাকাটা সিকেটা মিলত।

আমি স্থির করলুম, কোজাগর পূর্ণিমার রাতে বেরিয়ে পড়ব। সেদিন ত সিদ্ধি খেতেই হয়, আর সমস্ত রাত জাগতেও হয়। তাই মনে করলুম যে ঘরে বসে রাত জাগার চাইতে এক ঘটি সিদ্ধি খেয়ে রাত্তিরেই পড়ব বেরিয়ে—আর হেসে খেলে পাঁচ ক্রোশ পথ চলে যাব। রাত এগারটায় বেরলেও ভোর হতে না হতে নন্দীগ্রামে পৌছব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—"রাত্তিরে একা এই বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে ভয় করল না?" তিনি হেসে উত্তর করলেন "ভয় কিসের, চোর ডাকাতের? জানেন না, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়? চোর ডাকাত আমার নেবে কি? গলার তুলসী কাঠের মালা, না

গাঁয়ের নামাবলী ? তা ছাড়া এ অঞ্চলে যারা ডাকাতি করে, তারা সব আপনাদেরই মাইনে করা লেঠেল। তারা আমাকে ছোঁবে না, সঙ্গে হীরাজহরৎ থাকলেও নয়। ভয় অবশ্য বাঘের আছে. কিন্তু তারাও আমাদের মত গরিব ব্রাহ্মণদের ছোঁয় না। আমাদের শরীরে আছে হাড় আর চামড়া আর দু-তিন ছটাক রক্ত, কিন্তু রস একবারেই নেই। বাঘরাও মানুষ চেনে, অর্থাৎ কে খাদ্য আর কে অখাদ্য। সে যাই হোক, রাত এগারটা আন্দাজ বেরিয়ে পড়লুম। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খঞ্জনার ধারে গিয়ে পড়লুম। খঞ্জনা কখনও দেখেছেন ? চমৎকার নদী। রশি দু'তিনের চাইতে বেশি চওড়া নয়—কিন্তু বারো মাস তাতে জল থাকে, আর সে জল বারো মাস টল্‌টল্‌ করছে, তক্ তক্ করছে। এই খঞ্জনার ধার দিয়েই সোজা নন্দীগ্রামে যেতে হয়।

কোজাগর পূর্ণিমার রাত. চাঁদের আলোয় গাছ পালা সব হাসছে, আর আলোকলতায় ছাওয়া কুলের গাছগুলো দেখতে মনে হচ্ছে যেন সব সোনার তারে জড়ান। আমি মহা স্ফূর্তি করে চলেছি, ক্রমে পাল পাড়ার সমুখে গিয়ে উঠলুম। পালপাড়া বলে এখন কোনও গ্রাম নেই, কিন্তু তার নাম আছে। সমস্ত গ্রাম বনজঙ্গলে গ্রাস করেছে। শুধু এ গ্রামের সেকালের ধনকুবের সনাতন পালের আধক্রোশজোড়া ভাঙ্গা বাড়ি পালদের উড়ে যাওয়া টাকার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এমন সময় নদীর মধ্যে থেকে একটি গানের সুর আমার কানে এল। গানের সুর বোধ হয় ভাটিয়ালি। বাঁশীর মত মিষ্টি তার আওয়াজ। সে গান শোনবামাত্র মন উদাস হয়ে যায়, আর চোখে আপনা হতেই জল আসে। জীবনের যত আক্ষেপ যেন সে গানের মধ্যে আছে।

একটু পরে দেখি—পাঁচটি তামার ঘড়া উজান বেয়ে ভেসে আসছে

আর তার উপরে একটি ছেলে ঘোড়াসন হয়ে বসে গান করছে। সে যেন সাক্ষাৎ দেব-পুত্র। ধবধবে তার রঙ, কুঁদে কাটা তার মুখ, পায়ে তার সোনার মল, হাতে সোনার বালা ও বাজু, গলায় সাতনলী হার? বুকে ঝুলছে সোনার পৈতে। পরনে রক্তের মত লাল চেলি, কপালে রক্ত চন্দনের ফোঁটা। একটু লক্ষ্য করে দেখলুম, যা তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তা সোনার অলঙ্কার নয়—সোনার সাপ। আর সেই দেব-বালকের কোলে রয়েছে একটি ছোট ছেলের কঙ্কাল। তখন বুঝলুম, এটি হচ্ছে একটি যখ। আর মনে পড়ল ছেলেবেলায় শুনেছিলুম যে, পরম বৈষ্ণব সনাতন পাল একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে যখ দিয়েছিলেন সে তাঁর ধন রক্ষা করেছিল কিন্তু তার বংশ নির্বংশ করেছিল।

আমি সনাতন পালের পোড়ো-বাড়ির সুমুখে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে এই দিব্য-মূর্তি দেখছিলুম আর একমনে এই পাগল-করা গান শুনছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে কষ্টিপাথরের মত কালো একটুকরো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে। অমনি চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এই ঘোর অন্ধকারে সেই সব তামার ঘড়া আর সেই দেব-বালক অদৃশ্য হয়ে গেল —আর তার গানের সুরও আস্তে আস্তে আকাশে মিলিয়ে গেল। অমনি সেই মেঘও কেটে গেল, আর দিনের আলোর মত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় গাছপালা সব আবার হেসে উঠল।

তখন দেখি, আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, যেন আমার রক্তমাংসের শরীর পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

খানিকক্ষণ পরে আমার দেহ-মন ফিরে এল, আর নিশিতে পাওয়া লোক যে ভাবে হাঁটে সেইভাবে হাঁটতে হাঁটতে সূর্য ওঠবার আগে নন্দীগ্রামে গিয়ে পৌছলুম।

কিন্তু এই যখ দেখার কথা কাউকেও বলিনি। কারণ একথা মুখে মুখে প্রচার হলে, হাজার লোক খঞ্জনায় নেমে পড়ত ঐ তামার ঘড়ার তল্লাসে। অবশ্যই তাতে সব ঘড়া ডুবুরীরা উপরে তুলতে পারত না— মধ্যে থেকে তারা খঞ্জনার ফটিক জল শুধু ঘুলিয়ে দিত। আর যদি তারা সেই মোহর-ভরা ঘড়া তুলতেই পারত, তাহলে আরও সর্বনাশ হত। কারণ ঐ সব ঘড়ায় পোরা প্রতি মোহরটি সোনার সাপ হয়ে গিয়েছিল। সে সাপ যখের গায়ের গহনা. কিন্তু মানুষে ছোঁবামাত্র মারা যায়।

রমা ঠাকুরের গল্পও শেষ হল, আর পিসিমা এক বাটী পাচন নিয়ে এসে হাজির হলেন। এ গল্প যেমন শুনেছি তেমন লিখছি। আশা করি এই পাড়াগেঁয়ে গল্প তোমাদের কাছে পাড়াগেঁয়ে কবিরাজি পাচনের মত বিস্বাদ লাগবে না।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু সম্পাদিত অন্যান্য সঙ্কলন-গ্রন্থ

হাসির গল্পের সঙ্কলন

বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, প্রভাতকুমার, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, শিবরাম, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধ সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার, সরোজ রায়চৌধুরী, লীলা মজুমদার, রবীন্দ্রলাল রায়, সুনির্মল বসু, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু প্রভৃতির বাইশটি অপূর্ব হাসির গল্পের সঙ্কলন।

সচিত্র সংস্করণ মূল্য দুই টাকা মাত্র

ডিটেকটিভ গল্পের সঙ্কলন

একযুগ আগেকার গোয়েন্দা-কাহিনীর সঙ্কলয়িতা ৺শরৎচন্দ্র সরকারের 'দিনে-ডাকাতি', বাংলায় প্রথম শ্রেণীর গোয়েন্দা কাহিনীর প্রথম লেখক পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের 'চিঠিচুরি', গোয়েন্দা-কাহিনীর স্বনামধন্য লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'জাল-ডিটেকটিভ', ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের ...গার কার্যের অভিজ্ঞতার কাহিনী 'কৃত্রিম-মুদ্রা' প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্প এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। আড়াইশ পৃষ্ঠার উপর বিরাট গ্রন্থের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন ৺মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রকুমার রায়, শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়, আশালতা সিংহ, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি। ইহা ছাড়া এই গ্রন্থে রহিয়াছে গোয়েন্দা-কাহিনীর ভিত্তিতে লিখিত ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী প্রমুখের বিশিষ্ট রসরচনা।

সচিত্র সংস্করণ মূল্য আড়াই টাকা মাত্র